ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের
ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা

১৪ অক্টোবর ২০১২

নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহ
এ বি এম রাশেদুজ্জামান, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মোহাম্মদ হোসেন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মো. গোলাম মোস্তফা, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
খোরশেদ আলম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
জাফর চৌধুরী, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দলগত আলোচনা আয়োজনের জন্য সচেতন নাগরিক কমিটির সম্মানিত সভাপতিবৃন্দ ও টিআইবি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মী, মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার এ বি এম রাশেদুজ্জামান, মনিরুল ইসলাম জাহিদ, মোহাম্মদ হোসেন, মো. গোলাম মোস্তফা, খোরশেদ আলম ও জাফর চৌধুরী, করাপশন ডেটাবেজ-এর তথ্য বিশ্লেষণের জন্য প্রোগ্রাম ম্যানেজার জুলিয়েট রোজেটি, এবং সংসদ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাতেমা আফরোজ ও মোরশেদা আকতারের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং সাদিদ আহমেদ নূরে মওলা, সাধন কুমার দাস, তাসলিমা আকতার, জুলিয়েট রোজেটি, শাম্মী লায়লা ইসলাম, নাহিদ শারমিন, ফাতেমা আফরোজ ও অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয় নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে টিআইবি। জাতীয় সততা ব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় সংসদের ওপর টিআইবি 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনা করছে, যেখানে জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রম গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের ওপর এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা, জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক অর্থায়ন নিয়েও টিআইবি গবেষণা পরিচালনা করেছে। বর্তমান প্রতিবেদনটি এই ধারাবাহিকতার অংশ।

জাতীয় সংসদের সদস্যরা সংসদে তাদের দায়িত্ব প্রত্যাশিত পর্যায়ে পালন করছেন না বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে, যার পেছনে সংসদে অনুপস্থিতি, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম অংশগ্রহণ, এবং সরকারের জবাবদিহিতা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে না পারা অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এছাড়াও সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন আইন-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়মের অভিযোগ, এবং অনেক ক্ষেত্রে এসব কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে।

বাংলাদেশের সংসদীয় কার্যক্রমের ওপর ইতোমধ্যে বেশ কিছু গবেষণা সম্পন্ন হলেও সংসদ সদস্যদের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর গবেষণার অপ্রতুলতা লক্ষ করা যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ওপর নিয়মিত গবেষণার ধারাবাহিকতায় এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যেখানে সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের ওপর পর্যালোচনা করার প্রয়াস রয়েছে। গবেষণায় সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক কার্যক্রম ও এর ধরন পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এ থেকে উত্তরণের জন্য কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

টিআইবি'র গবেষক শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে এ গবেষণা পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে তাকে সহায়তা দিয়েছেন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার এ বি এম রাশেদুজ্জামান, মনিরুল ইসলাম জাহিদ, মোহাম্মদ হোসেন, মো. গোলাম মোস্তফা, খোরশেদ আলম ও জাফর চৌধুরী। এছাড়াও টিআইবি'র গবেষণা বিভাগের পরিচালকসহ অন্যান্য সহকর্মীরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন।

গবেষণা সম্পাদনে টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।
আমরা আশা করি এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণ সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের ওপর একটি ধারণা দিতে সক্ষম হবে, এবং বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দিক-নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনার মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	*iii*
সার-সংক্ষেপ	*iv*
১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা	**১**
১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য	৩
১.২ গবেষণা পদ্ধতি	৩
১.৩ প্রতিবেদনের কাঠামো	৪
২. সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনি কাঠামো	**৪**
২.১ সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা, অযোগ্যতা ও পদ শূন্য হওয়া	৪
২.২ সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৫
২.৩ সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা	৬
২.৪ বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি	৭
২.৫ সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা	৮
২.৬ সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতা	৯
২.৭ সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনের সীমাবদ্ধতা	১০
৩. নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ওপর সাধারণ তথ্য	**১১**
৪. সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম পর্যালোচনা	**১১**
৪.১ সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	১১
৪.২ সংসদের বাইরের কার্যক্রম	১৩
৪.২.১ সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক বা অনুকরণীয় কার্যক্রম	১৩
৪.২.২ সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কার্যক্রম	১৪
৪.২.৩ সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্টির মাত্রা	১৮
৫. সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ	**১৯**
৫.১ সংসদ সদস্যপদকে ‘আয়ের উৎস’ হিসেবে ব্যবহার	১৯
৫.২ কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা	১৯
৫.৩ দলীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অনুপস্থিতি	২০
৫.৪ ‘শাস্তি না হওয়ার সংস্কৃতি’র বিকাশ	২০
৬. উপসংহার ও সুপারিশ	**২১**
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী	২৩

সারণির তালিকা

সারণি ১: বর্তমান আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা	৭
সারণি ২: সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনের সীমাবদ্ধতা	১০

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক কার্যক্রম (n=৮০) (একাধিক ধরনের কার্যক্রমসহ)	১৩
চিত্র ২: এক বা একাধিক ধরনের ইতিবাচক কার্যক্রম	১৪
চিত্র ৩: নেতিবাচক কার্যক্রমের অভিযোগ আছে এমন সংসদ সদস্যের হার (১৪৯ জনের মধ্যে)	১৪
চিত্র ৪: সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ধরন (n=১৪৪) (একাধিক ধরনের কার্যক্রমসহ)	১৫
চিত্র ৫: এক বা একাধিক ধরনের অভিযোগ থাকার হার	১৫
চিত্র ৬: সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্টির মাত্রা (স্কোর সর্বনিম্ন ১ থেকে সর্বোচ্চ ১০)	১৯
চিত্র ৬: সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণ	২০

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভার মূল কাজ আইন প্রণয়ন করা, সরকারের নির্বাহী বিভাগের কাজ পর্যবেক্ষণ বা তদারকি করা, কমিটির শুনানির মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণ তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে আইন প্রণয়নে সাংবিধানিক ক্ষমতা ভোগ করে থাকে এবং এই প্রতিনিধিত্ব হয়ে থাকে সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে।

১৯৯১ সালে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী সংসদগুলো বিভিন্ন কারণে প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হয়নি বলে দেখা যায়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় সংসদ কার্যকর করার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ছিল। তবে নবম সংসদ গঠনের পর থেকে পরবর্তী তিন বছরে সংসদ সদস্যরা তাদের দায়িত্ব প্রত্যাশিত পর্যায়ে পালন করছেন না বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। এছাড়াও সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন আইন-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়ম, এবং অনেক ক্ষেত্রে এসব কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণাটি হাতে নেওয়া হয় এবং টিআইবি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানে দেখা যায় নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সংসদ সদস্যরা ইতিবাচক কর্মকাণ্ডেও জড়িত রয়েছেন। তবে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের আনুপাতিক হার পত্রিকায় প্রকাশিত হারের চেয়েও বেশি।

বাংলাদেশের সংসদীয় কার্যক্রমের ওপর ইতোমধ্যে বেশ কিছু গবেষণা সম্পন্ন হলেও সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর গবেষণার অপ্রতুলতা লক্ষ করা যায়। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্দেশ্যে টিআইবি'র নিয়মিত গবেষণার অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যেখানে সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের ওপর পর্যালোচনা করার প্রয়াস রয়েছে। এ বিষয়ে প্রথমবারের মতো একটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনার কারণ বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো সবগুলো রাজনৈতিক দল বিশেষ করে দু'টি অন্যতম প্রধান দলের নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা অন্যতম ও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এ গবেষণার উদ্দেশ্য সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক কার্যক্রম ও এর ধরন পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনি কাঠামো ও এর সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা;
২. সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক কার্যক্রম চিহ্নিত করা; এবং
৩. সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত নেতিবাচক কার্যক্রম ও এর কারণ পর্যালোচনা করা।

ইতিবাচক কার্যক্রম হিসেবে বোঝানো হয়েছে যেসব কাজের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামোগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, স্থানীয় সমস্যার সমাধান, সাধারণ জনগণের কল্যাণ এবং সার্বিকভাবে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন সাধন হয়েছে সে ধরনের কার্যক্রম। অন্যদিকে নেতিবাচক কার্যক্রম বলতে সংসদ সদস্যের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তার এখতিয়ারের বাইরের কার্যক্রম বোঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যের বিশ্লেষণ নবম সংসদের সব সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে এটি সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে আংশিক ধারণা দিতে সক্ষম। এছাড়া এটি শুধুমাত্র বিশ্লেষণমূলক, ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তদন্তমূলক নয়। টিআইবি ও সামাজিক গবেষণার নীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামকরণও এ গবেষণার উদ্দেশ্য নয়।

গবেষণাটি প্রাথমিক ও পরোক্ষ তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত। সংসদে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত কার্যক্রম পর্যালোচনার ক্ষেত্রে টিআইবি'র পার্লামেন্টওয়াচ প্রতিবেদন থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সংসদের বাইরের কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য জানুয়ারি ২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় পর্যায়ের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করে দেখা যায় নবম সংসদের ১৮১ জন সদস্য (সংসদ সদস্যদের ৫১.৭%) সম্পর্কে বিভিন্ন নেতিবাচক কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসব সংবাদের বিরুদ্ধে সংসদ সদস্যদের খুব সামান্য অংশই প্রতিবাদলিপি দিয়েছেন বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত বা প্রেস কাউন্সিলের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রকাশিত এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য টিআইবি স্থানীয় পর্যায়ে দল-নিরপেক্ষ এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে দলগত আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্যের ওপর তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়।

এ উদ্দেশ্যে সারাদেশের সাতটি বিভাগের ৪২টি জেলায় ৪৪টি দলগত আলোচনার আয়োজন করা হয়, যেখানে মোট ৬০০ জন আলোচক অংশগ্রহণ করেন। এসব আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ছিলেন স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবী, এবং গণমাধ্যম কর্মী। এসব দলগত আলোচনায় কোন আসনগুলোর সদস্যদের ওপর অলোচনা হবে তা সংশ্লিষ্ট আলোচকরা নির্ধারণ করেন, এবং যেসব সংসদ সদস্যের ওপর কোনো তথ্য আলোচকদের কাছে ছিল না, গবেষণার বিশ্লেষণে সেসব সংসদ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এভাবে ২২০টি আসনে মধ্য থেকে ১৪৯টি আসনের সংসদ সদস্যদের নিয়ে আলোচনা হয়, এবং আলোচকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তথ্য ও মতামত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সংসদ সদস্যদের ওপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের যথার্থতা যাচাই করা হয়, এবং সম্পূরক তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধান, সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি, সংসদ ও সংসদ সদস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইন ও বিধি, গ্রন্থ, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ, এবং ওয়েবসাইট ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহার করা হয়। গবেষণায় নবম সংসদের শুরু থেকে ২০১২ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দলগত আলোচনাগুলো ২০১২ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আয়োজিত হয়।

উল্লেখ্য, এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যের বিশ্লেষণ নবম সংসদের সব সদস্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম। এছাড়া এটি শুধুমাত্র বিশ্লেষণমূলক, ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তদন্তমূলক নয়।

২. সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনি কাঠামো

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারসহ সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আইন রয়েছে। সংসদ কিভাবে তার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং সংসদ সদস্যদের এতে কী ভূমিকা থাকবে সেজন্য রয়েছে সংসদীয় কার্যপ্রণালী-বিধি। এছাড়া সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী হিসেবে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা, এবং ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্যপদ বাতিল হওয়া সংক্রান্ত আইনের জন্য রয়েছে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২' এবং 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯'।

২.১ *সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনের সীমাবদ্ধতা*

সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের পরে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আইনি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বিভিন্ন আর্থিক তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হলেও সংসদ সদস্য হিসেবে প্রকাশ, এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়। সংসদ সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য কোনো আচরণ বিধি নেই। উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা আইনগতভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দলের বিপক্ষে ভোট দিলে বা দলের পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকলে সংসদের সদস্যপদ বাতিল হবে। অন্যদিকে জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের জবাবদিহি করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

সারণি ১: সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনের সীমাবদ্ধতা

বিষয়	আইনগত বিধি-বিধান	আইনগত সীমাবদ্ধতা
আর্থিক তথ্য (আয়, ব্যয়, সম্পদের বিবরণী) প্রকাশ	▪ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক	▪ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়
বিল, কর ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	▪ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বিল, কর ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনে প্রদান করা বাধ্যতামূলক যা নির্বাচন কমিশন জনগণের কাছে প্রকাশ করবে	▪ কালোটাকা সাদা করেছেন কিনা এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়
স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ	▪ সংসদীয় কমিটিতে সদস্য হওয়ার আগে কোনো প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত বা আর্থিক স্বার্থ আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে (কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী)	▪ স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ওপর সুনির্দিষ্ট আইন নেই
ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ	▪ প্রার্থী হিসেবে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক	▪ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়
নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব প্রদান	▪ নির্বাচনের পরে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক যা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করার কথা	▪ দাখিলকৃত হিসাব যাচাই-বাছাইয়ের বাধ্যবাধকতা ও ব্যবস্থা নেই
নির্বাচনী আচরণ বিধি	▪ সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি রয়েছে যা ভঙ্গের ফলে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে	▪ শাস্তির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতার অভাব রয়েছে
সংসদ সদস্যদের জন্য	▪ সংসদে শৃঙ্খলা ভঙ্গের ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা	▪ আচরণ বিধি নেই

বিষয়	আইনগত বিধি-বিধান	আইনগত সীমাবদ্ধতা
আচরণ বিধি	রয়েছে	
সংসদ সদস্যদের এখতিয়ার	▪ উপজেলা পরিষদে উপদেষ্টা করার মাধ্যমে এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট	▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়নের জন্য এটি প্রতিবন্ধক
সংসদে অংশগ্রহণ	▪ সংসদ অধিবেশনে ৮৯ কার্যদিবস পর্যন্ত অনুপস্থিতি অনুমোদিত	▪ স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই
দলের কাছে জবাবদিহিতা	▪ দলের বিপক্ষে ভোট দিলে বা দলের পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকলে সদস্যপদ বাতিল হবে	▪ জনস্বার্থ-বিরোধী আইন পাসের বিরোধিতা করা বা নিজের দলের সমালোচনা করা সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের পক্ষে সম্ভব হয় না
জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা	▪	▪ পাঁচ বছর পর নির্বাচন ছাড়া জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই

৩. সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম পর্যালোচনা

৩.১ সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ৬৭%। সংসদ সদস্যদের দেরিতে উপস্থিতির কারণে নিয়মিত কোরাম সংকট দেখা যায়। নবম সংসদের প্রথম থেকে একাদশ অধিবেশন পর্যন্ত (২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে ২০১১ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত) কোরাম সংকটের মোট সময় ৭,৭৮৫ মিনিট, যার আর্থিক মূল্য ৩২ কোটি ৬৯ লাখ টাকা।[১] প্রধান বিরোধী দলের ধারাবাহিক সংসদ বর্জনের কারণে বিরোধী দলের সব সদস্য ২৫% এর কম কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। ২৫৪ দিনের মধ্যে বিরোধী দল উপস্থিত ছিল ৫৪ দিন (মোট কার্যদিবসের ২১.২৫%)।[২]

নবম সংসদের প্রথম থেকে সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত সময়ে দেখা যায় অধিবেশনের মোট সময়ের মাত্র ৯.২% আইন প্রণয়নে ব্যয় হয়, এবং এর ২৭% বিভিন্ন বিলের ওপর আপত্তি ও সংশোধনী নিয়ে আলোচনার ওপর ব্যয় হয়। বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া মূল বিষয়ে বিলের ওপর সরকারি দলের সদস্যদের আপত্তি ও সংশোধনী প্রস্তাব দিতে আগ্রহ ছিল না। অন্যদিকে সংসদ বর্জনের কারণে এই প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল ন্যূনতম। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। একজন সদস্য বেসরকারি বিল হিসেবে ‘সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০০৯’ উত্থাপন করেন, যা এখনো আইন হিসেবে প্রণীত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

তবে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ২৩.৮% সময় ব্যয় হয় যা সরকারের জবাবদিহিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সংসদে বিভিন্ন আলোচনায় সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণের হার অপেক্ষাকৃত কম ছিল। বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেন এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের ব্যাপক সমালোচনা করেন। তবে মন্ত্রীদের বিব্রতকর প্রশ্নের জবাব না দেওয়ার প্রবণতা ছিল। রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়েও সংসদে কোনো আলোচনা হয়নি। প্রশ্নোত্তর পর্বে নারীদের মধ্যে সংরক্ষিত আসনের সদস্যরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন বলে দেখা যায়। তবে আলোচনা করতে গিয়ে সংসদ সদস্যরা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেন। এক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা নিজ দলের নেতার প্রশংসা, বিরোধী দলের নেতার সমালোচনা, ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণাত্মক ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন।

নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত হওয়ার পর থেকে সবগুলো কমিটি সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত ৬৪১টি বৈঠকে নয় শতাধিক সুপারিশ করে যার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি বলে জানা যায়। স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিরোধী দলের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল অন্যতম একটি ইতিবাচক দিক।

৩.২ সংসদ সদস্যদের সংসদের বাইরের কার্যক্রম

গবেষণায় আলোচিত ১৪৯টি আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে পুরুষ সংসদ সদস্য ১৪১ জন (৯৪.৬%) ও নারী সদস্য আটজন (৫.৪%); এবং সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ১৩৬ (৯১.৩%, যা সরকারদলীয় মোট সদস্যের ৪৩.৯%) ও বিরোধীদলীয় ১৩ জন (৮.৭%)। সরকারদলীয় সদস্যদের মধ্যে মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী ২৭ জন (১৮.১%)। দলগত আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য ও মতামতের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে – ইতিবাচক বা অনুকরণীয় কার্যক্রম এবং নেতিবাচক কর্মকাণ্ড।

৩.২.১ সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক বা অনুকরণীয় কার্যক্রম

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদ সদস্যদের ৫৩.৭ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের ইতিবাচক কার্যক্রমের সাথে জড়িত বলে দেখা যায়। এদের মধ্যে নারী সংসদ সদস্য ছয়জন, মন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রী ১৯ জন, এবং বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য পাঁচজন।

---

[১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ জানুয়ারি ২০১২। টিআইবি’র পার্লামেন্টওয়াচ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড়ে ৪২ হাজার টাকা খরচ ধরে এই আর্থিক মূল্য প্রাক্কলন করা হয়েছে।

[২] *প্রাগুক্ত*।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অবদান রাখা সদস্যরা (৩৫%) নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, ভূমি বরাদ্দ, অনুদান বরাদ্দ, বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ, চরাঞ্চলে চিকিৎসা সেবা, নতুন কোর্স চালু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ (এমপিওভুক্তি) ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় নিজ আসনে অবদান রাখছেন। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণ বা তদারকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের (৩১.৩%) বেশিরভাগ রাস্তা, সেতু নির্মাণ বা সংস্কার প্রকল্প অনুমোদন, তদারকি, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রেলসড়ক উন্নয়ন ইত্যাদির উদ্যোগ নিয়েছেন। স্থানীয় সমস্যা সমাধানে সংসদ সদস্যদের (১৮.৮%) গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে উপকূলীয় এলাকায় জলদস্যু নিয়ন্ত্রণ ও লবণাক্ততা দূর করা, নদী ভাঙ্গন রোধ, চরমপন্থী দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, পাটকল চালু, হাওর এলাকায় ডুবন্ত রাস্তা তৈরির উদ্যোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কার্যক্রমের (১৭.৫%) মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান, পরিবেশ রক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, বিরোধীদলীয় ১৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে আটজনেরই কোনো ধরনের ইতিবাচক কার্যক্রম দেখা যায় না। এর কারণ হিসেবে দলগত আলোচনাগুলোতে একটি জেলায় সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের একচ্ছত্র আধিপত্যকে দায়ী করা হয়।

চিত্র ১: সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক কার্যক্রম (n=৮০) (একাধিক ধরনের কার্যক্রমসহ)

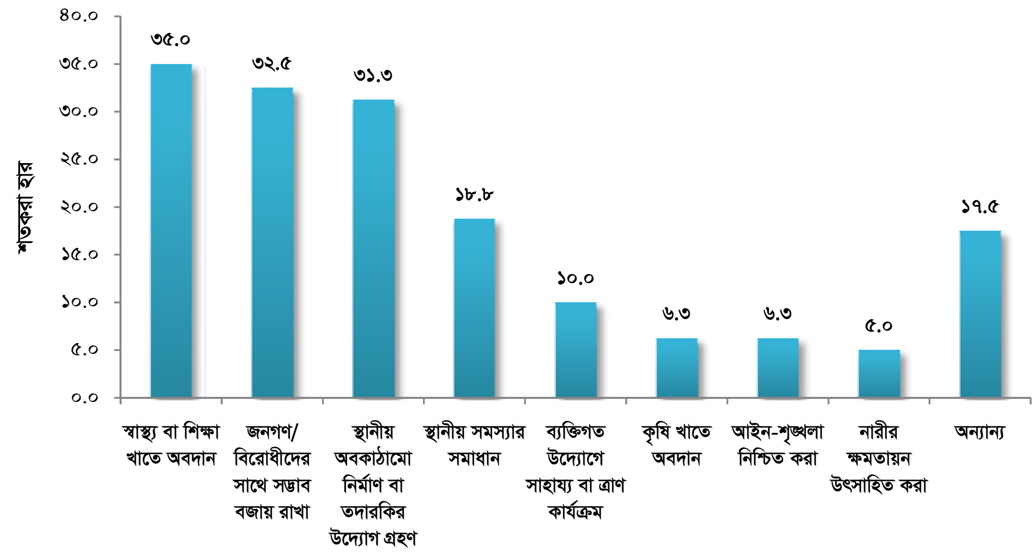

৩.২.২ সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কার্যক্রম

দলগত আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে সংসদ সদস্যদের ৯৭ শতাংশ বিভিন্ন নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত দেখা যায়। নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িতদের মধ্যে নারী সদস্য সাতজন, ২৭ জন মন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রীর সবাই, এবং বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য ১২ জন।

চিত্র ২: সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ধরন (n=১৪৪) (একাধিক ধরনের কার্যক্রমসহ)

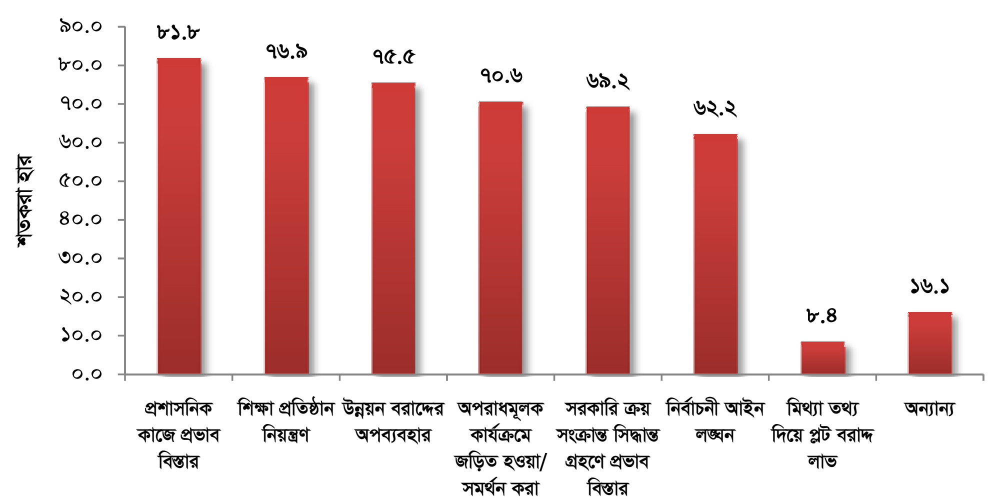

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৮১.৮% স্থানীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রভাব সৃষ্টি করেন। সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে খুব কম ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করা হয়েছে, আবার পাল্টা মামলাও করা হয়েছে বলে জানা যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বদলি করে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের চাপে।

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৭৬.৯% স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটি নিয়ন্ত্রণ ও সংসদ সদস্যের নিজের পছন্দের সদস্য নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ, অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেওয়া, কমিশনের বিনিময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও-ভুক্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ অপব্যবহার, বরাদ্দ পেতে দুর্নীতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসব অনিয়ম করতে গিয়ে শিক্ষক লাঞ্ছনার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৭৫.৫% স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন বরাদ্দ নিজের কাজে ব্যবহার করেন। এ ধরনের ঘটনার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবহার বা তদারকি না করা, স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুবিধা নেওয়া, স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলের নেতা-কর্মীদের প্রাধান্য দেওয়া, এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে কমিশন আদায় করা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সদস্যরা প্রকল্প অনুমোদন ও তদারকিতে প্রভাব সৃষ্টি, ভুয়া প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ, টিআর-কাবিখা-কাবিটা বিতরণ ও ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম করেন। দেখা যায়, উন্নয়ন বরাদ্দ অপব্যবহারকারী সংসদ সদস্যদের ৭৮.৭% এসব বরাদ্দ অনুমোদন দিতে গিয়ে কমিশন আদায় করেন। কমিশনের হার কমপক্ষে ৫%। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে বেশি কমিশন দিতে পারে সেই কাজ পায়, দল এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়।

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৭০.৬% বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতির সাথে জড়িত, যার মধ্যে রয়েছে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ, দখল (সরকারি খাস জমি, নদী, খাল, জলমহাল, পুকুর), চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি। এসব সদস্যের ৫৩.৫% নিজেই বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত, এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় নেতা-কর্মীরা এসব অপরাধের সাথে জড়িত। দেখা যায় এসব সংসদ সদস্যের মাত্র ২৪.১%-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মামলা করার সাহস পায় না, অথবা সংসদ সদস্যদের প্রভাব এত বেশি যে তাদের অনুমতি ছাড়া থানা মামলা নেয় না।

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৬৯.২% জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকলেও এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করেন। এসব সদস্যের ৭১.৭ শতাংশের হয় নিজের অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অথবা অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে ঠিকাদারি ব্যবসা পরিচালনা করেন। প্রায় ৮৯% ক্ষেত্রে একটি আসনের উন্নয়নমূলক কাজ পায় ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী; বাকি ক্ষেত্রেও কমিশনের বিনিময়ে কাজ দেওয়া হয়। দরপত্র কিনতে বা জমা দিতে বাধা দেওয়া, সমঝোতার মাধ্যমে কাজ বণ্টন, কমিশনের বিনিময়ে কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদ সদস্যদের ৬২.২% এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ এসেছে। এর মধ্যে প্রার্থীকে মৌখিকভাবে মনোনয়ন দেওয়া, দলীয়ভাবে সমর্থন, অর্থের বিনিময়ে সমর্থন, নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে ৮.৪% ঢাকা শহরে নিজের বা স্ত্রীর নামে একাধিক জমি ও ফ্ল্যাট থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা হলফনামার ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন।

৩.২.৩ সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে জনগণের সন্তুষ্টির মাত্রা

দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে চারটি নির্দেশকের ওপর ভিত্তি করে সন্তুষ্টির মাত্রা জানতে চাওয়া হয়। সন্তুষ্টির সর্বনিম্ন মান ১ থেকে সর্বোচ্চ ১০ ধরে এতে সার্বিকভাবে স্কোর আসে ৪.১৮। এতে দেখা যায় বিরোধীদলীয় সদস্যরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ, সংসদে এলাকার প্রতিনিধিত্ব বা স্থানীয় কার্যক্রমের উদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও জনগণের সাথে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছেন। উল্লেখ্য, ৬৮.৪৫% সংসদ সদস্য ৫-এর নিচে স্কোর পেয়েছেন, যেখানে মাত্র ৩.৩৬% ৭.৬ বা তার বেশি স্কোর পেয়েছেন। অর্থাৎ বর্তমান বেশিরভাগ সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে জনগণ সন্তুষ্ট নয় বলে ধরা যায়।

চিত্র ৩: সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্টির মাত্রা (স্কোর সর্বনিম্ন ১ থেকে সর্বোচ্চ ১০)

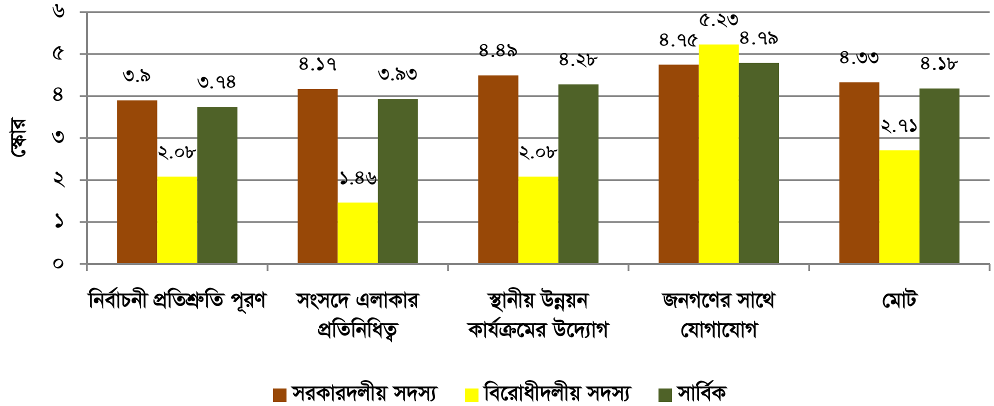

৪. সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ

৪.১ 'সংসদ সদস্যপদ'কে আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহার

বর্তমান সরকার গঠনকারী দলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনের আগের সাত বছর রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে ছিলেন। দলীয় নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন সংসদ সদস্যরা। এ ধরনের স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ দান পরবর্তী নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের পক্ষে সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য এক ধরনের বিনিয়োগও বটে।

৪.২ কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে সংসদ সদস্যরা শুধু দলের কাছে দায়বদ্ধ। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়বদ্ধতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকে।
- বিভিন্ন আর্থিক (আয়-ব্যয়, সম্পদ, আয়কর, ঋণ, অপ্রদর্শিত অর্থ) ও অন্যান্য তথ্য (মামলা, উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবহার) প্রকাশের কোনো আইনি বিধান না থাকার ফলে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে সংসদের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জনগণের কাছে কোনো তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য নন।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ততা, মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও প্রভাব আইনগতভাবে স্বীকৃত থাকার কারণে উপজেলা পর্যায়ে সংসদ সদস্যরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এর ফলে একদিকে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারছে না, আর অন্যদিকে এটি সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের জন্য পরবর্তী নির্বাচনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার সুযোগ, যার অপব্যবহার করার সুযোগ নেন অনেক সদস্য।
- কোনো সদস্যের সদস্যপদ বাতিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (নির্বাচন কমিশন বা সংসদ) এখতিয়ার সুস্পষ্ট নয়। এর ফলে এ ধরনের পরিস্থিতির সুযোগে অভিযুক্ত সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো উদাহরণ তৈরি হচ্ছে না।
- সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি এবং বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ট্রেজারি বেঞ্চের (মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী) একচ্ছত্র আধিপত্য লক্ষ করা যায়। এ কারণে ব্যাকবেঞ্চার ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে সীমিত। আনুপাতিক হারে অন্তর্ভুক্তির কারণে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমিত।

৪.৩ দলীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অনুপস্থিতি

সবগুলো বৃহৎ রাজনৈতিক দলে স্থানীয় পর্যায়ে দীর্ঘদিন কমিটি না হওয়া, সম্মেলন না হওয়া, পরবর্তী নেতৃত্ব তৈরি না হওয়া ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান। এর ফলে একদিকে সংসদ সদস্যরা নিজ দলের সমালোচনার জন্য দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে অসহনশীল আচরণ পেয়ে থাকে, এবং অন্যদিকে বিরোধী দলের প্রতি অসহনশীল ও নেতিবাচক মনোভাব দেখা যায়।

৪.৪ 'শাস্তি না হওয়ার সংস্কৃতি'র (culture of impunity) বিকাশ

নেতিবাচক কাজে জড়িত সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে 'শাস্তি না হওয়ার সংস্কৃতি' বিকশিত হয়েছে, যার ফলে সংসদ সদস্যরা নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ছেন না।

৫. সুপারিশ

ক. সংসদে কার্যকর অংশগ্রহণ বাড়ানো

১. সংসদ সদস্যদের স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে যেন তারা তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব আরও আন্তরিকতার সাথে পালন করতে পারে। এজন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন থেকে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বন্ধ করতে হবে।

২. সংসদ বর্জন আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে। সংসদ সদস্যদের সংসদে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান ৯০ দিনের অনুমোদন কমিয়ে নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়া সর্বোচ্চ ৩০ দিন এবং একটানা সাতদিনের বেশি অনুপস্থিত থাকা নিষিদ্ধ করতে হবে।
৩. বিরোধী দলের কার্যকর এবং ন্যায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন, দল থেকে ডেপুটি স্পিকারের পদত্যাগ এবং পরবর্তী নির্বাচনে একই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে নির্বাচনের সুযোগ করে দিতে হবে। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্তত ৫০% সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করতে হবে।
৪. নিজ দল থেকে স্পিকারের পদত্যাগ এবং পরবর্তী নির্বাচনে একই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে নির্বাচনের সুযোগ করে দিতে হবে।
৫. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে। অনাস্থা প্রস্তাব, জাতীয় বাজেট, এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু বিষয় ছাড়া অন্যান্য যেকোনো বিষয়ে দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

খ. নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা

৬. সকল রাজনৈতিক দলে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা বিকশিত করতে হবে। সংসদ সদস্যদের জন্য জাতীয় সংসদে উত্থাপিত 'আচরণ বিধি' বিল আইনে পরিণত করতে হবে।
৭. সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। এর পাশাপাশি সংসদ সদস্যের নিজ রাজনৈতিক দল থেকেও শক্তিশালী ভূমিকা নিতে হবে। বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সংসদ সদস্যদের দল থেকে বহিষ্কার এবং পরবর্তী নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। প্রত্যাশিত পর্যায়ে কাজ না করার জন্য সংসদ সদস্যকে প্রত্যাহার (recall) বা বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা (special meeting) করার বিধান করতে হবে।
৮. সংসদ সদস্যদের আর্থিক (আয়-ব্যয়, সম্পদ, ঋণ, আয়কর ইত্যাদি) ও অন্যান্য তথ্য (মামলা, নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবহার ইত্যাদি) নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে, এবং সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে জনগণ যেন তথ্য পেতে পারে তার জন্য তথ্য অধিকার আইন সংশোধন করতে হবে। সকল সংসদ সদস্যের সংসদ অধিবেশন ও সংসদীয় কমিটিতে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।
৯. সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে, এবং এ কাজটি করতে হবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর আগে থেকেই। নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রার্থীদের সম্পর্কে তুলনামূলক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে যেন জনগণ তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ কাজে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজের সদস্য ও প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সংবাদ-মাধ্যমকেও উদ্যোগ নিতে হবে।
১০. স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যেতে পারে, যেখানে খোলাখুলিভাবে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের বিষয়ে জনগণ জানতে পারবে এবং মতামত দিতে পারবে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজ ও প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগ নিতে হবে।

****

নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের
ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা*

শাহজাদা এম আকরাম†

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভার মূল কাজ আইন প্রণয়ন করা, সরকারের নির্বাহী বিভাগের কাজ পর্যবেক্ষণ বা তদারকি করা, কমিটির শুনানির মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া (যেমন যুদ্ধ ঘোষণা বা সংবিধান সংশোধন করা)। আইন প্রণয়নের পাশাপাশি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করাও আইনসভার অন্যতম প্রধান কাজ।[১] প্রশ্নোত্তর, মনোযোগ আকর্ষণ, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে বক্তব্য প্রদান, এবং স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনসভা সরকারের নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।[২] জনগণ তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে আইন প্রণয়নে সাংবিধানিক ক্ষমতা ভোগ করে থাকে এবং এই প্রতিনিধিত্ব হয়ে থাকে সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান যা সংসদীয় আসন ব্যবস্থাভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বাংলাদেশ বর্তমানে ৩০০টি সংসদীয় এলাকায় বিভক্ত – প্রতিটি আসন থেকে একজন সদস্য জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন।[৩] উল্লেখ্য, বাংলাদেশসহ অন্যান্য 'ওয়েস্টমিনিস্টার' ধরনের আইনসভাগুলোতে 'ক্যান্ডিডেট ব্যালট' পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই ধরনের ভোট ব্যবস্থাকে বলা হয় 'First Past the Post (FPTP)' ব্যবস্থা, যা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে সহজ এবং সর্বাধিক প্রচলিত (রেনল্ডস, রেইলি ও এলিস, ২০০৫)। এ ধরনের ভোট ব্যবস্থায় কোনো একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনী আসনে একজন প্রার্থী অন্য প্রার্থীদের যে কারও চেয়ে বেশি ভোট পেলেই তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। সাধারণভাবে এই প্রক্রিয়ায় ভোটাররা একজনকে সরাসরি ভোট দিয়ে থাকেন তার দলকে সমর্থন করার জন্য। ফলে দেখা যায় একজন সংসদ সদস্য একইসাথে তার দলের প্রতিনিধি, তার নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি, বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠী, শ্রেণী বা পেশার প্রতিনিধি, এবং সর্বোপরি জাতির প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

সংসদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা তেমন ব্যাপক নয়, এবং তাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা লক্ষ করা যায়। মারে'র (২০০০) গবেষণা অনুযায়ী সংসদীয় আসনের স্বার্থ রক্ষা, সরকারের সাথে সমস্যায় জড়িত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সহায়তা, সরকারি নীতি বাস্তবায়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা নিশ্চিত করা, সরকার কী করছে সে ব্যাপারে সংসদীয় এলাকার জনগণকে অবহিত করা, এবং সংসদে বিতর্ক ও আইন প্রণয়ন করা সংসদ সদস্যদের মূল কাজ বলে জনগণ মনে করে। অন্যদিকে ওয়াইল্ডার (১৯৯৯) ও কৃষ্ণা (২০০২) দেখিয়েছেন জনগণ প্রত্যাশা করে রাজনীতিকরা তাদের জন্য কাজ করবে, এবং তাদের ব্যক্তিগত সাহায্যে কাজে আসবে। বাংলাদেশের জনগণ সংসদ সদস্যদের যেসব ভূমিকায় দেখতে চায় সেগুলো হচ্ছে স্থানীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ব্যক্তিগত পর্যায়ে জনগণকে সেবা দেওয়া, স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা, এলাকার সার্বিক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করা, সংসদে এলাকার সমস্যা তুলে ধরা, সংসদে নিয়মিত উপস্থিতি, এবং জনগণের কল্যাণে আইন প্রণয়ন করা (আকরাম, দাস ও মাহমুদ, ২০০৮)। তবে একই গবেষণায় দেখা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নে হস্তক্ষেপ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে জনগণ সংসদ সদস্যদের দেখতে চায় না। রহমানের (২০০৯) ভাষায়:

> "What is a typical MP in the current system expected to do? He (and sometimes she) is expected to beef-barrel. His re-election is dependent on how many culverts are built, how many mosques have been renovated, how the relief has been distributed, or how the fertilisers have been disbursed. He gets to have a say in the local schools, libraries, and cultural functions. I've been told by a former MP, he has to arbitrate (salish) on disputes including marital problems."

---

* ২০১২ সালের ১৪ অক্টোবর ঢাকায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে উপস্থাপিত।

† শাহজাদা এম আকরাম টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত।

১ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭২, ৭৫, ৭৬।

২ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭।

৩ তবে এর বাইরে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রয়েছে আরও ৫০টি।

ব্যক্তিগত পর্যায়ের সহযোগিতা সব গণতান্ত্রিক দেশেই বিদ্যমান, তবে উন্নয়নশীল বিশ্বে এর প্রবণতা বেশি দেখা যায়, আর এ ধরনের কার্যক্রম রাজনীতিকদের ভাবমূর্তি গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। রাজনীতিকদের ভাবমূর্তি ভোটারদের কাছে নির্বাচন-পূর্ব প্রতিশ্রুতি পূরণ করার সাফল্যের ওপরও নির্ভরশীল। ভাবমূর্তি গঠনের উপায় – একদিকে তাদের প্রতিশ্রুতির বিষয়ে ভোটারদের জানানো, সেগুলো পূরণ করা, নির্বাচনের দিন ভোটারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, এবং অন্যদিকে যারা এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সফল তাদের সহায়তা গ্রহণ করা। জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য বা তেমন জনপ্রিয় নয় এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া 'দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের' (Patron-client relationship) মাধ্যমে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে যা দীর্ঘ মেয়াদে রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে (কিফার ও ভ্লাইচু)।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।[৪] ১৯৯০ এর গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৯১ সালে পঞ্চম সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর পরবর্তী সংসদগুলো বিভিন্ন কারণে প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হয়নি বলে দেখা যায় (মাহমুদ, ২০০৭)। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় সংসদ কার্যকর করার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ছিল। বর্তমান সরকার গঠনকারী জোটের প্রধান দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার ছিল কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেওয়া, একটি আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা, এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন করা হবে বলে অঙ্গীকার করে আওয়ামী লীগ।[৫] অন্যদিকে বর্তমান প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সকল নির্বাচিত প্রতিনিধির সম্পদের বিবরণী প্রকাশ, ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া বৈঠক বর্জন নিষিদ্ধ, এবং সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের বেশি সংসদ বর্জন করলে সদস্যপদ বাতিল করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।[৬]

বাংলাদেশের সংসদীয় কার্যক্রমের ওপর ইতোমধ্যে বেশ কিছু গবেষণা (আশরাফ, ২০০১; ফিরোজ, ২০০৩; হাসান উজ্জামান, ২০০৬; মোল্লা (তারিখহীন); আকরাম, দাস ও মাহমুদ, ২০০৮; রোজেটি ও অন্যান্য, ২০১২; জাহান, ২০১১) সম্পন্ন হলেও সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর গবেষণার অপ্রতুলতা লক্ষ করা যায়। সংসদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে টিআইবি অষ্টম সংসদের শুরু থেকে নিয়মিতভাবে 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে, যেখানে শুধুমাত্র সংসদীয় কার্যক্রমের ওপর গবেষণাভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়। সম্প্রতি দৈনিক যুগান্তরের পক্ষ থেকে ৩০০ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ওপর একটি জরিপ পরিচালিত হয় যেখানে ঐ মুহূর্তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কোন আসনে কোন দলের কোন প্রার্থী জয়ী হবেন এই বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৭] নবম সংসদ গঠনের পর থেকে পরবর্তী তিন বছরে সংসদ সদস্যরা তাদের মূল দায়িত্ব প্রত্যাশিত পর্যায়ে পালন করছেন না বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে (রোজেটি ও অন্যান্য, ২০১১; জাহান, ২০১১)। এসব গবেষণায় বর্তমান সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যের সংসদে নিয়মিত অনুপস্থিতি, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের ন্যূনতম অংশগ্রহণ, এবং সরকারের জবাবদিহিতা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে না পারা। এছাড়াও সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন আইন-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়ম, এবং অনেক ক্ষেত্রে এসব কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতির কারণে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে (নজরুল, ২০১২; লিটন, ২০১২)।

নবম সংসদের সদস্যদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত সময়ে জাতীয় পর্যায়ের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে নবম সংসদের ১৮১ জন সদস্যের (সংসদ সদস্যদের ৫১.৭%) বিভিন্ন নেতিবাচক

---

[৪] ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা স্বীকৃত ছিল। ১৯৭৫ সালে সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সংসদের গুরুত্ব খর্ব করা হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিশাসিত সংসদীয় ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। ১৯৯০ এর গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৯১ সালে পঞ্চম সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

[৫] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, "... জাতীয় সংসদকে কার্যকর ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে ... রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেয়া হবে (প্যারা ৫.৩)।" "রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা হবে ...। একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে (প্যারা ৫.৪)।" এছাড়াও পরিশিষ্টে বলা হয়, "... সংসদকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ... ও সহনশীল আচরণ প্রতিষ্ঠা করা হবে।" (পরিশিষ্ট, 'সংকটমোচন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আওয়ামী লীগের রূপকল্প (ভিশন ২০২১): ২০২১ সাল নাগাদ কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই')।

[৬] বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, *বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও*।

[৭] এই জরিপে মূলত পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয় – দ্রব্যমূল্য, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্নীতি, সংসদ সদস্যদের সঙ্গে দলীয় নেতা-কর্মীদের সম্পর্ক, এলাকার উন্নয়ন ও শেয়ারবাজার নিয়ে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন *দৈনিক যুগান্তর*, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে বলে দেখা যায়।[৮] সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন অনিয়ম ও আইন-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রভাব সৃষ্টি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসেবে অনিয়ম ও দুর্নীতি, স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প অনুমোদন ও তদারকিতে দুর্নীতি, স্থানীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি, খুন বা খুনের হুমকি, স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে দুর্নীতি, সরকারি ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি ও সম্পত্তি দখল, রাজনৈতিক সহিংসতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এর বাইরে স্বজনপ্রীতি, বিল ও ঋণের খেলাপ, অবৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি, সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার, এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষমতার দাপট দেখানোর অভিযোগ ওঠে বিভিন্ন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে।

এসব সংবাদের ভিত্তিতে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে বাংলাদেশের সংসদ সদস্যদের সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ কতটুকু যথার্থ? সংসদ সদস্যরা কি কেবলমাত্র নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িত? তারা কি কোনো ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখেন না? তাদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডগুলো কী কী? কোন ধরনের নেতিবাচক কার্যক্রমে তারা বেশি জড়িত? এসব নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের পেছনের কারণগুলো কী? আরও প্রশ্ন ওঠে, সংসদ সদস্যরা তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কতটুকু পূরণ করছেন? তাদের কার্যক্রম নিয়ে জনগণের মূল্যায়ন কী?

এর পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্দেশ্যে টিআইবি'র নিয়মিত গবেষণার অংশ হিসেবে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যেখানে সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের ওপর পর্যালোচনা করার প্রয়াস রয়েছে। এ বিষয়ে প্রথমবারের মতো একটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনার কারণ বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো সবগুলো রাজনৈতিক দল বিশেষ করে দু'টি অন্যতম প্রধান দলের নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা অন্যতম ও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার উদ্দেশ্য সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক কার্যক্রম ও এর ধরন পর্যালোচনা করা।

এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনি কাঠামো ও এর সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা;
২. সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক কার্যক্রম চিহ্নিত করা; এবং
৩. সংসদ ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত নেতিবাচক কার্যক্রম ও এর কারণ পর্যালোচনা করা।

ওপরের উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রতিবেদনে সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনি কাঠামো পর্যালোচনা, সংসদ সদস্যদের সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ও সংসদের বাইরের ইতিবাচক ও নেতিবাচক কার্যক্রম পর্যালোচনা, সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম মূল্যায়ন, এবং সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইতিবাচক কার্যক্রম হিসেবে বোঝানো হয়েছে যেসব কাজের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামোগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, স্থানীয় সমস্যার সমাধান, সাধারণ জনগণের কল্যাণ এবং সার্বিকভাবে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন সাধন হয়েছে সে ধরনের কার্যক্রম। অন্যদিকে নেতিবাচক কার্যক্রম বলতে সংসদ সদস্যের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তার এখতিয়ারের বাইরের কার্যক্রম বোঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যের বিশ্লেষণ নবম সংসদের সব সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে এটি সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে আংশিক ধারণা দিতে সক্ষম। এছাড়া এটি শুধুমাত্র বিশ্লেষণমূলক, ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তদন্তমূলক নয়। টিআইবি ও সামাজিক গবেষণার নীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামকরণও এ গবেষণার উদ্দেশ্য নয়।

১.২ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি প্রাথমিক ও পরোক্ষ তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত। সংসদে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত কার্যক্রম পর্যালোচনার ক্ষেত্রে টিআইবি'র পার্লামেন্টওয়াচ প্রতিবেদন থেকে বিশ্লেষিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

অন্যদিকে সংসদের বাইরের কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য প্রাথমিকভাবে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১২ সময়ে প্রধান পাঁচটি জাতীয় দৈনিকে[৯] প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তীতে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাধারণ জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের ওপর তথ্যের অপ্রতুলতার কথা বিবেচনা করে স্থানীয় পর্যায়ে দল-নিরপেক্ষ

---

[৮] উল্লেখ্য, এসব সংবাদের বিরুদ্ধে সংসদ সদস্যদের খুব সামান্য অংশই প্রতিবাদলিপি দিয়েছেন বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত বা প্রেস কাউন্সিলের দ্বারস্থ হয়েছেন।

[৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, *দৈনিক যুগান্তর*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক কালের কণ্ঠ* ও *ডেইলি স্টার*।

এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে দলগত আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্যদের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একটি জেলায় অবস্থিত আসনগুলোকে একটি গুচ্ছ ধরে সারাদেশের সাতটি বিভাগের ৪২টি জেলা বাছাই করা হয়, যেখানে মোট আসন সংখ্যা ২২০। এসব জেলায় ৪৪টি দলগত আলোচনার আয়োজন করা হয়, যেখানে মোট ৬০০ জন আলোচক অংশগ্রহণ করেন। এসব আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ছিলেন স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবী, এবং গণমাধ্যম কর্মী। এসব দলগত আলোচনায় কোন আসনগুলোর সদস্যদের ওপর অলোচনা হবে তা সংশ্লিষ্ট আলোচকরা নির্ধারণ করেন, এবং যেসব সংসদ সদস্যের ওপর কোনো তথ্য আলোচকদের কাছে ছিল না, গবেষণার বিশ্লেষণে সেসব সংসদ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এভাবে ২২০টি আসনে মধ্য থেকে ১৪৯টি আসনের সংসদ সদস্যদের নিয়ে আলোচনা হয়, এবং আলোচকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তথ্য ও মতামত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সংসদ সদস্যদের ওপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের যথার্থতা যাচাই করা হয়, এবং সম্পূরক তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধান, সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি, সংসদ ও সংসদ সদস্য সংক্রান্ত অন্যান্য আইন ও বিধি, গ্রন্থ, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ, এবং ওয়েবসাইট ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহার করা হয়। সংসদের বাইরের বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে একাধিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত একই ঘটনার ওপর প্রতিবেদন একবারই বিবেচনায় আনা হয়েছে।

গবেষণায় নবম সংসদের শুরু থেকে ২০১২ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দলগত আলোচনাগুলো ২০১২ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আয়োজিত হয়।

১.৩ প্রতিবেদনের কাঠামো

প্রতিবেদনের শুরুতে সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনি কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান আইন অনুযায়ী সংসদ ও স্থানীয় পর্যায়ে সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব, সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, অন্যান্য বিষয় আলোচনা, এবং একইসাথে আইনি সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর নবম সংসদের সদস্যদের উল্লেখযোগ্য কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে গবেষণার ফলাফল দুই ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়েছে – সংসদ সদস্যদের সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, এবং সংসদের বাইরে দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এবং এসব সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সবশেষে এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করা হয়েছে।

২. সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনি কাঠামো

সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের মূল্যায়নের জন্য এ সংক্রান্ত আইনি কাঠামো সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি বাংলাদেশের সংবিধান।[১০] সংবিধানের পঞ্চম ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে সংসদ প্রতিষ্ঠা, নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা, নারী সদস্য, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া, সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক, দ্বৈত সদস্যতায় বিধিনিষেধ, সংসদের অধিবেশন, সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ, সংসদের ওপর মন্ত্রীদের অধিকার, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন, কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম, সংসদের স্থায়ী কমিটি, ন্যায়পাল, সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি, এবং সংসদ সচিবালয় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত। সংবিধানের পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া, এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা।

সংবিধানের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারসহ সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আইন রয়েছে। সংসদ কিভাবে তার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং সংসদ সদস্যদের এতে কী ভূমিকা থাকবে সেজন্য রয়েছে সংসদীয় কার্যপ্রণালী-বিধি। এছাড়া সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী হিসেবে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা, এবং ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্যপদ বাতিল হওয়া সংক্রান্ত আইনের জন্য রয়েছে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২' এবং 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯'।

২.১ সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা, অযোগ্যতা ও পদ শূন্য হওয়া

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শিক্ষা, বংশ, মর্যাদা ইত্যাদি নির্বিশেষ যেকোনো নাগরিকের জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।[১১] সংবিধান অনুযায়ী একজন সংসদ সদস্যের বয়স হতে হবে ন্যূনতম ২৫ বছর, এবং অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।[১২]

[১০] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৬৫ - ৭৯।

[১১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৬৬ (১) (২)।

[১২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৬৬ (১)।

অন্যদিকে কোনো উপযুক্ত আদালত থেকে অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হওয়া, দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় থেকে অব্যাহতি না পাওয়া, বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করা অথবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করা, নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ন্যূনতম দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া এবং মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হওয়া, প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকা, এবং কোনো আইনের দ্বারা নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হওয়াকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বা সংসদ সদস্য থাকার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৩] আইন অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সরকারের সাথে কোনো ধরনের লেন-দেনের সম্পর্ককে অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ সরকারের সাথে ব্যবসা রয়েছে এমন ব্যক্তি সংসদ সদস্যপদের জন্য প্রার্থী হতে পারবে না।[১৪] এছাড়াও দেশ বা দেশের বাইরের কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত যুদ্ধাপরাধী, সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে বিলখেলাপি, এবং ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণের খেলাপিরাও সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না।[১৫]

সংসদ সদস্যপদ যেসব কারণে শূন্য হতে পারে সেগুলো হচ্ছে নির্বাচনের পর ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচিত ব্যক্তি শপথ গ্রহণ করতে বা শপথনামায় স্বাক্ষর করতে না পারা, সংসদের অনুমতি না নিয়ে একাধারে ৯০ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকা, সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া, অনুচ্ছেদ ৬৬ (২) এর অধীনে অযোগ্য হয়ে যাওয়া, অথবা সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া।[১৬] তবে উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যকে কে অযোগ্য ঘোষণা করবে তা সুস্পষ্ট নয়। এছাড়াও একজন সংসদ সদস্য স্পিকারের কাছে নিজ স্বাক্ষরযুক্ত চিঠির মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারেন।[১৭]

২.২ সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২.২.১ *সংসদে দায়িত্ব ও কর্তব্য*

তাত্ত্বিকভাবে সংসদ সদস্যদের মূল কাজ প্রধানত তিনটি — সংসদে নিজ নিজ এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা, সংসদীয় বিতর্কে অংশগ্রহণ করা, এবং ভোটে অংশগ্রহণ করা (বেসলি ও লারসিনেজ, ২০০৫)। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব আইন প্রণয়ন [অনুচ্ছেদ ৬৫ (১)], রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন [অনুচ্ছেদ ৪৮], রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন [অনুচ্ছেদ ৫২] বা অপসারণ [অনুচ্ছেদ ৫৩], প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন [অনুচ্ছেদ ৫৬], স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন এবং স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান [অনুচ্ছেদ ৭৪], কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন [অনুচ্ছেদ ৭৫], সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা [অনুচ্ছেদ ৭৩], জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে বিল উত্থাপন [অনুচ্ছেদ ৮০], এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণ করা [অনুচ্ছেদ ৭৬]। লক্ষণীয়, সংবিধানে উল্লিখিত সবগুলো দায়িত্বই সংসদে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত, এবং সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের উপর কোনো নির্বাহী দায়িত্ব অর্পিত হয়নি।

২.২.২ *স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য*

সাম্প্রতিককালে সাংবিধানিক দায়িত্বের পাশাপাশি বাংলাদেশের সংসদ সদস্যদের ওপর আইনগতভাবে কিছু নির্বাহী দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আইন অনুযায়ী একজন সংসদ সদস্য তার আসন যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, এবং পরিষদের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে পরামর্শ দিতে পারবেন।[১৮] এছাড়া একজন সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকা-সংশ্লিষ্ট উপজেলায় উপজেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি এবং অন্যান্য কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের পরামর্শ মানতে উপজেলা পরিষদ বাধ্য।[১৯] এর ফলে যেখানে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে হওয়ার কথা সেখানে সংসদ সদস্যদের মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও প্রভাব আইনগতভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

---

[১৩] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৬৬ (২)।

[১৪] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯*, ধারা ১২ (৩খ)।

[১৫] *প্রাগুক্ত*।

[১৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৬৭ (১)।

[১৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৬৭ (২)।

[১৮] *জেলা পরিষদ আইন, ২০০০*, ধারা ৩০। এখানে বলা হয়েছে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্বাচিত কোনো জেলার সংসদ সদস্যগণ উক্ত জেলার পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং তাঁহারা পরিষদকে উহার কার্যাবলী সম্পাদনে পরামর্শদান করিতে পারিবেন"।

[১৯] *উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮* (২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত), ধারা ২৫ (১), ৪২(৩)। ২৫ (১) ধারায় বলা হয়েছে, "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-এর অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হইতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করিবে।" ৪২(৩) ধারায় বলা হয়েছে, "পরিষদ উহার প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।" উল্লেখ্য, নবম সংসদের শুরুর দিকে বিলুপ্ত স্থানীয় সরকার কমিশনের পক্ষ থেকে এই ধারার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া হয়, এবং একইসাথে কমিশন স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে দুই কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করে (সূত্রঃ *ডেইলি স্টার*, ২২ জানুয়ারি ২০০৯)।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকার জন্য বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়। এই বিশেষ বরাদ্দ 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প' এর অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য, এবং এর অধীনে প্রতি সংসদীয় আসনের জন্য ১৫ কোটি টাকা করে মোট ৪,৬৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।[২০] উল্লেখ্য, সাধারণ বরাদ্দ সরাসরি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অনুমোদিত হলেও বিশেষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাছাই, গ্রহণ ও উপ-বরাদ্দ সংসদ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে হতে হবে।[২১] এসব ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ সদস্য/ নারী সদস্য, এবং পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কাউন্সিলর অথবা এলাকার যে কোনো সমাজকর্মী কিংবা একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে প্রকল্পের চেয়ারম্যান করা হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে সংসদ সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান বিধি অনুসারে একজন সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত সর্বোচ্চ চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের (গভার্নিং বডি) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।[২২] এছাড়া জেলা সদর হাসপাতালের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।[২৩]

২.৩ সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৮ এর ওপর ভিত্তি করে সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত আইন প্রথম প্রণীত হয় ১৯৭৩ সালে, যা ২০১০ সালে নবম সংসদের চতুর্থ অধিবেশনে সর্বশেষবার সংশোধন করা হয়।[২৪] তবে সরকারের অংশ হিসেবে এবং সংসদে নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসেবে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন পর্যায়ের মন্ত্রী, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের পারিশ্রমিক-ভাতা অন্যান্য সংসদ সদস্যের তুলনায় বেশি।[২৫]

নিয়মিত পারিশ্রমিক ও ভাতার বাইরে সংসদ সদস্যরা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পান। তাঁরা সংসদ অধিবেশন চলাকালীন এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য দৈনিক ভাতা পেয়ে থাকেন। প্রথমবার নির্বাচিত প্রত্যেক সংসদ সদস্য শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির[২৬] সুবিধা পান এবং গাড়ির জ্বালানি, চালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক ৪০ হাজার টাকা ভাতা পেয়ে থাকেন সকল সংসদ সদস্য।[২৭] সংসদ সদস্যের নিজের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের চিকিৎসা সুবিধা একজন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড সরকারি কর্মকর্তার সম-পর্যায়ের।

রাজধানীতে আবাসিক সুবিধা হিসেবে সংসদ সদস্যরা জাতীয় সংসদ ভবন-সংলগ্ন এমপি হোস্টেলে বা ন্যাম ফ্ল্যাটে স্বল্প ভাড়ায় কক্ষ বা ফ্ল্যাটের বরাদ্দ পেয়ে থাকেন। এছাড়া যেসব সংসদ সদস্যের ঢাকায় নিজস্ব বাড়ি নেই, আবেদনের ভিত্তিতে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়। নবম সংসদের ১৪০ জন সদস্য উত্তরা সম্প্রসারিত তৃতীয় প্রকল্প এবং পূর্বাচল উপশহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দ পান।[২৮] উল্লেখ্য, অষ্টম সংসদের ১১৫ জন সদস্যকে সরকারের পক্ষ থেকে প্লট দেওয়া হয়।[২৯]

---

[২০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ মার্চ ২০১০।

[২১] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ, 'গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পরিপত্র ২০১০-১১', ২০১১, প্যারা ৭।

[২২] *মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভার্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা*, ২০০৯, বিধান ৫(১)।

[২৩] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন, ...হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭/১৮৯ (তারিখ-০৫/৪/০৯ ইং)।

[২৪] নবম সংসদের চতুর্থ অধিবেশনে (৪ এপ্রিল ২০১০) এ সংক্রান্ত প্রণীত আইনগুলো হচ্ছে *The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010, The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010, The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010, The Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2010,* এবং *The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Act, 2010*।

[২৫] সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর পারিশ্রমিক ৫৮,৬০০ টাকা, সংসদের স্পিকারের ৫৭,২০০ টাকা, ডেপুটি স্পিকার ও মন্ত্রীদের ৫৩,১০০ টাকা, প্রতিমন্ত্রীদের ৪৭,৮০০, এবং উপমন্ত্রীদের ৪৫,১৫০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা সংসদ সদস্যদের তুলনায় বেশি।

[২৬] এক্ষেত্রে একজন সংসদ সদস্য শুল্কমুক্ত একটি সেডান কার বা জিপ আমদানির সুবিধা পান। তবে একাধিক মেয়াদে নির্বাচিত হলে তিনি একটি গাড়ি আমদানির সুবিধা গ্রহণের পাঁচ বছর পর সংসদ সদস্য থাকাকালে পরবর্তী গাড়ি আমদানির সুযোগ পাবেন।

[২৭] সংসদ সচিবালয়ের তথ্য অনুযায়ী নবম সংসদের ৩১৫ জন সদস্য শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির অনুমোদন নিয়েছেন, এবং তাদের মধ্যে ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত গাড়ি আমদানি করেছেন ২৭৫ জন। এসব শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা (সূত্র: *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ জুন ২০১২)। উল্লেখ্য, এই খাতে অষ্টম সংসদে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২৮০ কোটি টাকা।

[২৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.rajukdhaka.gov.bd/rajuk/PurbachalPlotResult/sc_MP_Purbachal.pdf; http://www.rajukdhaka.gov.bd/rajuk/PhasePlotResult2009/sc_MP_Uttara3rdPhase.pdf

আবাসন সুবিধা ছাড়াও সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু বা শারীরিক ক্ষতির জন্য বীমা সুবিধা পেয়ে থাকেন, যা বর্তমানে দশ লাখ টাকা। এছাড়াও সংসদ সদস্যরা কূটনৈতিক পাসপোর্ট পেয়ে থাকেন। নবম সংসদে সব সদস্যকে জাতীয় সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে নিজস্ব কার্যালয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং প্রথম দফায় ৯২ জনকে পুরানো এমপি হোস্টেলে কার্যালয় বুঝিয়ে দেওয়া হয়।[৩০]

সারণি ১: বর্তমান আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা

প্রাপ্য সুবিধা (মাসিক)	**পরিমাণ (টাকা)**	**প্রাপ্য সুবিধা (দৈনিক)**	**পরিমাণ (টাকা)**
পারিশ্রমিক বা সম্মানী	২৭,৫০০	অধিবেশন চলাকালীন ভাতা	৮০০
আপ্যায়ন ভাতা	৩,০০০	যাতায়াত ভাতা	২০০
নির্বাচনী এলাকা ভাতা	৭,৫০০	দায়িত্ব পালনের জন্য আবাসস্থলে অবস্থান	৩০০
চিকিৎসা ভাতা	৭০০		
টেলিফোন বিল	৭,৮০০	**প্রাপ্য সুবিধা (বার্ষিক)**	**পরিমাণ (টাকা)**
নির্বাচনী এলাকায় অফিস খরচ	৯,০০০	ভ্রমণ ভাতা	৭৫,০০০
গাড়ি ভাতা	৪০,০০০	নির্বাচনী এলাকার জন্য থোক বরাদ্দ	২,০০,০০০
পর্দা, বালিশের কাভার, বিছানার চাদর, বেডকভার, টয়লেট্রিজ, ক্রোকারিজ	৪,০০০		
ধোলাই খরচ	১,০০০	বীমা	১০,০০,০০০

সূত্র: *The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Act, 2010*

সার্বিকভাবে মাসে একজন সংসদ সদস্য পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ভাতা হিসেবে এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে থাকেন। সংসদে অংশগ্রহণের জন্য বছরে কমপক্ষে ১১০ দিনের জন্য প্রাপ্ত ভাতা এবং অন্যান্য বার্ষিক ভাতা যোগ করা হলে একজন সংসদ সদস্য এক বছরে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ভাতা হিসেবে পেয়ে থাকেন কমপক্ষে ১৬ লাখ ৭৮ হাজার টাকা।

উল্লেখ্য, সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক ও ভাতা ১৯৭৩ সালের আইনে আয়করমুক্ত না থাকলেও ১৯৭৪ সালের সংশোধিত আইনে তা আয়করমুক্ত করা হয়। তবে নবম সংসদে আইন সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী, স্পিকার-ডেপুটি স্পিকার এবং সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক-ভাতা আবার আয়করের আওতাভুক্ত করা হয়।[৩১]

২.৪ বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি

সংসদীয় পরিভাষায় 'বিশেষ অধিকার' সংসদ এবং এর বিভিন্ন কমিটির জন্য সামগ্রিকভাবে এবং এর সদস্যদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রযোজ্য বিশেষ কিছু অধিকার এবং বিশেষ দায়মুক্তি বোঝায়। বাংলাদেশের সংবিধান ও কার্যপ্রণালী-বিধিতে সংসদ সদস্যদের ও কমিটির কিছু বিশেষ অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এবং এর বাইরেও কিছু বিশেষ অধিকার প্রথাগতভাবে পালিত হয়ে এসেছে। সংবিধান অনুযায়ী সংসদের যে সদস্যের ওপর সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ, কার্য-পরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে, তিনি সকল ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে কোনো আদালতের এখতিয়ারের অধীন হবেন না। সংসদে বা সংসদের কোনো কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।[৩২] স্পিকারের অনুমতি ছাড়া সংসদীয় এলাকার মধ্যে কোনো সংসদ সদস্যকে গ্রেফতার করা বা অন্য কোনো ধরনের আইনি কার্যক্রম চালানো যাবে না।[৩৩]

সংসদ অধিবেশন চলাকালীন কোনো সদস্য বক্তব্য উপস্থাপন করার সময় অন্য কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অশালীন বক্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ, আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ, হেয় প্রতিপন্ন করা, এবং যৌক্তিক কারণ ছাড়া দোষারোপ করতে পারবেন না।[৩৪]

---

[২৯] *ডেইলি স্টার*, ৯ জুন ২০০৯। এর মধ্যে ৯৫ জন বিএনপি'র, নয়জন জামাত-ই-ইসলামীর, পাঁচজন জাতীয় পার্টির ও ছয়জন তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের।

[৩০] *ডেইলি স্টার*, ২২ জুন ২০০৯।

[৩১] নবম সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে (২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২) এ সংক্রান্ত *The Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2012,* এবং *The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Act, 2012* প্রণীত হয়, এবং ত্রয়োদশ অধিবেশনে (২৯ মে ২০১২) *The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2012, The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2012, The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2012* প্রণীত হয়। উল্লেখ্য, এসব আইন ২০১১ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর করা হয়েছে।

[৩২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৮ (২) ও (৩)।

[৩৩] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, এবং ১৭৫।

[৩৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ২৭০ (২), (৫), (৬), (৭) এবং (৯), এবং ২৭১।

অন্যদিকে সংসদে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার জন্য সংসদ সদস্যদের জন্য স্পিকারের পক্ষ থেকে সতর্কতা সংকেত প্রদান, বক্তব্যদান বন্ধ করে দেওয়া, বহিষ্কার, এবং অধিবেশনে যোগদান সাময়িকভাবে স্থগিত করার বিধান রয়েছে।[৩৫] বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি এখনো প্রণীত হয়নি, তবে আচরণ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো কিছু শর্ত সংবিধান ও নির্বাচনী আইনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন নির্ধারিত তথ্য প্রকাশ, নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট অযোগ্যতা এবং সদস্যপদ খারিজ হওয়ার বিভিন্ন কারণ।[৩৬]

২.৫ সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা

স্বচ্ছতা বলতে খুব সাধারণভাবে বোঝায় তথ্যের উন্মুক্ততা। সরকারের ভেতরে, মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন জনগণের সাথে সরকারের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ যেখানে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভোটারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর এর জন্য প্রয়োজন জনগণকে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ।[৩৭]

জনগণের তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে জানার জন্য তথ্যের অবাধ প্রবাহ অত্যাবশ্যকীয়। তথ্যের অবাধ প্রবাহ সংসদের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য তাদের ওপর বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের তথ্য সরবরাহের বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা বলা হয়। এর মধ্যে রয়েছে মনোনয়নের পূর্বে তাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ, নির্বাচনের পরে নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ (মোল্লা)। এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য স্টাপেনহার্স্ট ও পেলিজ্জো (২০০৬) একটি ‘কার্যকর নৈতিক শাসন ব্যবস্থা’র (effective ethics regime) কথা উল্লেখ করেন, যা আইন প্রণেতাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন। এই নৈতিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ‘নৈতিকতা বিধি’ (Code of Ethics) ও ‘আচরণ বিধি’ (Code of Conduct) অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি গৃহীত ‘সংসদীয় উন্মুক্ততার ধারণা’র[৩৮] অধীনেও সংসদ সদস্যদের অতীত কার্যক্রম, তাঁদের কর্মকাণ্ড, সম্পদ বিবরণী, সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা সংসদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।[৩৯]

২.৫.১ তথ্য প্রকাশ

আইন অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে আট ধরনের তথ্য[৪০] প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি মনোনয়ন-পত্রের সাথে নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে প্রার্থীর স্থাবর সম্পদের ধরন, অবস্থান ও মূল্য, ব্যাংক ডিপোজিট, বন্ড ইত্যাদির পরিমাণ, দায়ের ধরন ও পরিমাণ, বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ, এবং আয়কর রিটার্নের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিতে হয়।[৪১] সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হয়, যা নির্বাচন কমিশন জনগণের কাছে প্রকাশ করতে আইনগতভাবে বাধ্য।[৪২]

---

[৩৫] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, বিধি ১৪ (৩), (৫) ও (৬), ১৫ থেকে ১৭, ২৭০ (২), (৫), (৬), (৭) এবং (৯), ২৭১, ২৭৩ এবং ৩০৩।

[৩৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৬৬ (২) (ঘ) (ঘঘ), (৪) ও (৫), অনুচ্ছেদ ৬৯।

[৩৭] কিভাবে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায় সেজন্য দেখুন Compendium of Good Practices on Security Sector Reform, *The Issue of Transparency*, <http://www.gfn-ssr.org/good_practice.cfm> (৪ জানুয়ারি ২০০৭)।

[৩৮] সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের সংসদীয় পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের কার্যক্রম, গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি উদ্যোগের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সংসদীয় উন্মুক্ততার বিষয়ে একটি খসড়া ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এর ওপর জুনের ১১ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত জনমত সংগৃহীত হয়, ইটালীর রোম-এ ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ই-পার্লামেন্ট সম্মেলনে ঘোষণাপত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। এ ঘোষণাপত্রে ইতোমধ্যে বিশ্বের ৬০টি দেশের ৮৫টি সংসদীয় পর্যবেক্ষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমর্থন দিয়েছে। টিআইবি এই ঘোষণাপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে শুরু থেকে জড়িত ছিল, এবং বাংলাদেশে এ বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে।

[৩৯] *সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘোষণাপত্র*, অনুচ্ছেদ ২৪, ২৫।

[৪০] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন* ২০০৯, ধারা ৬ (গ)। এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রার্থীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারি অপরাধের তালিকা, অতীতের ফৌজদারি মামলার তালিকা ও ফলাফল, প্রার্থীর পেশা, প্রার্থীর আয়ের উৎস(সমূহ), অতীতে সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে ভূমিকা, প্রার্থী ও তার ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়-দেনার বর্ণনা, এবং ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে এবং এমন কোম্পানি থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা যে কোম্পানির তিনি সভাপতি, বা নির্বাহী পরিচালক বা পরিচালক।

[৪১] *নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮*, বিধি ২৯, ৩১।

[৪২] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন* ২০০৯, ধারা ২১।

তবে নির্বাচিত হওয়ার পরে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী প্রকাশ করা সংসদ সদস্যদের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়।[৪৩] সংসদীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে কোনো প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত বা আর্থিক স্বার্থ আছে কিনা তা যাচাই করার কথা, তবে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়। আবার সরকারের সাথে কোনো ধরনের লেন-দেনের সম্পর্ক থাকলে একজন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন না, অথবা নির্বাচিত হয়ে থাকলে সংসদের সদস্যপদ হারাবেন।[৪৪]

২.৫.২ *আচরণ বিধি*

বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে (যেমন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, জার্মানি, গ্রেনাডা, ইসরায়েল, জাপান, ফিলিপাইন, ফ্রান্স ইত্যাদি) সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি বা এ সংশ্লিষ্ট আইন রয়েছে।[৪৫] তবে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের জন্য কোনো আচরণ বিধি গৃহীত হয়নি। সরকার গঠনকারী প্রধান দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্য[৪৬] জাতীয় সংসদে 'সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০০৯' উত্থাপন করেন। সরকারি উদ্যোগে নয় বলে এটি বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপিত হয়, যা আইনে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াধীন। প্রস্তাবিত আচরণ বিধিতে প্রধানত যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

- সংসদ সদস্যদের নৈতিক অবস্থান;
- সাধারণ আচরণের মূলনীতি, যেমন সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আত্মস্বার্থহীনতা, দৃঢ়তা, বস্তুনিষ্ঠতা, ও নেতৃত্ব মেনে চলা;
- সংসদের ভেতরে সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন;
- স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও আর্থিক তথ্য নির্দিষ্ট ফরমের মাধ্যমে প্রতিবছর প্রকাশ;
- জনপ্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালনে জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে প্রাধান্য দেওয়া;
- স্বার্থগত দ্বন্দ্বে অথবা দায়িত্ব পালনে প্রভাবান্বিত করতে পারে এমন ধরনের কোনো উপঢৌকন গ্রহণ না করা;
- সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধাসমূহ কোনো অবস্থাতেই আর্থিক উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করা;
- সরকারি বা বেসরকারি খাতে কোনো প্রকার নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, জ্যেষ্ঠতা বা অন্য কোনো সিদ্ধান্তে সুবিধা পেতে সুপারিশ বা অন্যান্য হস্তক্ষেপ অথবা স্বীকৃত পদ্ধতির পরিবর্তন না করা; সরকারি ক্রয়-বিক্রয়, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকারি নীতি নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার ব্যক্তিগত বা দলীয় প্রভাব বিস্তার বা স্বার্থ অর্জন না করা;
- দলীয় স্বার্থ বা অবস্থানের ঊর্ধ্বে থেকে স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠভাবে মতামত ব্যক্ত করা;
- সংসদ অধিবেশনে সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী আচরণ করা; ব্যক্তিগত আক্রমণ, কুৎসামূলক বক্তব্য, অযাচিত সমালোচনা বা স্তুতি, আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা এবং অসৌজন্যমূলক অঙ্গভঙ্গি সচেতনভাবে পরিহার; এবং
- আচরণ বিধি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে 'নৈতিকতা কমিটি' নামে একটি সংসদীয় নৈতিক আচরণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন, এবং এর ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালীর বিবরণ।

২.৬ সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতা

আভিধানিক সংজ্ঞা অনুসারে জবাবদিহিতা অর্থ জন-প্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিষয়ে অন্যান্য জন-প্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা (ম্যাকলিন ও ম্যাকমিলান, ২০০৬)। নরিস (২০০৪) সংখ্যাগরিষ্ঠতার (majoritarian) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থায় প্রচলিত জবাবদিহিতার নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো চিহ্নিত করেন, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১. ***আইনসভার কাছে দায়বদ্ধতা:*** সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ আইনসভা থেকে উদ্ভূত এবং এর কাছে দায়বদ্ধ। মন্ত্রীসভা (কেবিনেট) দৈনিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে সমন্বিতভাবে সংসদ সদস্যদের কাছে জবাবদিহি করে। সংসদের প্রশ্নোত্তর, বাজেট আলোচনা, বিশেষ কমিটির প্রতিবেদন, নৈতিকতা কমিটির মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। তাছাড়া একজন সংসদ সদস্য তার নির্বাচনী এলাকায় জন-সম্পৃক্ত থেকে, সংসদে বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করে, সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন বরাদ্দ চাওয়ার মাধ্যমে, সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতার ওপর সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং সর্বোপরি ব্যাকবেঞ্চার হিসেবে এসব ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশে একজন সংসদ সদস্য ৮৯ কার্যদিবস পর্যন্ত সদস্যপদ না হারিয়ে সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকতে পারেন।[৪৭]

---

[৪৩] সম্প্রতি মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টাসহ সরকার বা প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত সম-মর্যাদা ও তুলনীয় মর্যাদার ব্যক্তিদের সম্পদ ও হিসাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়ার বিষয়টি মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে। তবে এ হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখা হয়েছে। এই নির্দেশের আওতায় সংসদ সদস্যদের আনা হয়নি (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ জুলাই ২০১১।

[৪৪] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২, ধারা ১২(১)(ট)।

[৪৫] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন <www.ipu.org>।

[৪৬] ঢাকা ৯ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী।

[৪৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৬৭ (১)।

২. ***দলের কাছে দায়বদ্ধতা:*** সংবিধান অনুযায়ী কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি ঐ দল থেকে পদত্যাগ করলে বা সংসদে ঐ দলের বিপক্ষে ভোট দিলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে। তিনি যদি সংসদে উপস্থিত থেকেও ভোটদানে বিরত থাকেন বা সংসদের কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তিনি তার দলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।[৪৮] এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব, দলীয় নেতৃত্ব এবং আইনসভায় নিজ-দলীয় হুইপদের কাছে সংসদ সদস্যরা তাদের ব্যক্তিগত কার্যক্রমের জন্য দায়বদ্ধ। দলীয় শৃঙ্খলা শক্তিশালী থাকলে এবং দলের ব্যাপ্তি বিশাল থাকলে এসব ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা দলের কাছে বেশি দায়বদ্ধ থাকেন কারণ এর ওপর নির্ভর করে পরবর্তী নির্বাচনে তিনি দল থেকে মনোনয়ন পাবেন কিনা। যেসব সদস্য দলীয় নীতি সমর্থন করেন না বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যর্থ বলে বিবেচিত, তারা পরবর্তীতে দলীয় মনোনয়ন না-ও পেতে পারেন।
৩. ***জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা:*** সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল তাদের কার্যক্রমের জন্য যৌথভাবে দায়বদ্ধ এবং এই কার্যক্রম অনুযায়ী ভোটারদের কাছ থেকে পুরস্কার বা তিরস্কার পেয়ে থাকে। প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যেকার শক্তিশালী যোগাযোগ। সংসদ সদস্য ও ভোটারদের মধ্যেকার যোগাযোগের মাত্রা নির্ণয়ের একটি নির্দেশক হচ্ছে কোনো সংসদ সদস্যের সাথে গত এক বছরে ভোটারদের কোনো ধরনের যোগাযোগ হয়েছে কিনা। জনগণের কাছে জবাবদিহি করার কোনো আইনি বা পদ্ধতিগত ব্যবস্থা এখনো বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি।

২.৭ সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনের সীমাবদ্ধতা

ওপরের আলোচনা থেকে বাংলাদেশের সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনের সারাংশ ও সীমাবদ্ধতা সারণি ২ এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। লক্ষণীয়, সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের পরে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আইনি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বিভিন্ন আর্থিক তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হলেও সংসদ সদস্য হিসেবে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয়। আবার সংসদের স্থায়ী কমিটিতে সদস্যপদের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করার বিধি থাকলেও এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়। সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রযোজ্য কোনো আচরণ বিধি এখনো নেই। উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা আইনগতভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। সংসদে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ৮৯ কার্যদিবস পর্যন্ত অনুপস্থিতি অনুমোদিত থাকলেও স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা নেই। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ দ্বারা দলের কাছে দায়বদ্ধতা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ দলের বিপক্ষে ভোট দিলে বা দলের পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকলে সংসদের সদস্যপদ বাতিল হবে। ফলে জনস্বার্থ-বিরোধী আইন পাসের বিরোধিতা করা বা নিজের দলের সমালোচনা করা সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্যদিকে যাদের দ্বারা একজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত তাদের অর্থাৎ জনগণের কাছে জবাবদিহি করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

সারণি ২: সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইনের সীমাবদ্ধতা

বিষয়	আইনগত বিধি-বিধান	আইনগত সীমাবদ্ধতা
আর্থিক তথ্য (আয়, ব্যয়, সম্পদের বিবরণী) প্রকাশ	▪ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক	▪ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়
বিল, কর ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	▪ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বিল, কর ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনে প্রদান করা বাধ্যতামূলক যা নির্বাচন কমিশন জনগণের কাছে প্রকাশ করবে	▪ কালোটাকা সাদা করেছেন কিনা এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়
স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ	▪ সংসদীয় কমিটিতে সদস্য হওয়ার আগে কোনো প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত বা আর্থিক স্বার্থ আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে (কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী)	▪ স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ওপর সুনির্দিষ্ট আইন নেই
ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ	▪ প্রার্থী হিসেবে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক	▪ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়
নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব প্রদান	▪ নির্বাচনের পরে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক যা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করার কথা	▪ দাখিলকৃত হিসাব যাচাই-বাছাইয়ের বাধ্যবাধকতা ও ব্যবস্থা নেই
নির্বাচনী আচরণ বিধি	▪ সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি রয়েছে যা ভঙ্গের ফলে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে	▪ শাস্তির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতার অভাব রয়েছে
সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি	▪ সংসদে শৃঙ্খলা ভঙ্গের ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে	▪ আচরণ বিধি নেই
সংসদ সদস্যদের এখতিয়ার	▪ উপজেলা পরিষদে উপদেষ্টা করার মাধ্যমে এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট	▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়নের জন্য এটি প্রতিবন্ধক
সংসদে অংশগ্রহণ	▪ সংসদ অধিবেশনে ৮৯ কার্যদিবস পর্যন্ত অনুপস্থিতি অনুমোদিত	▪ স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই

[৪৮] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭০।

বিষয়	আইনগত বিধি-বিধান	আইনগত সীমাবদ্ধতা
দলের কাছে জবাবদিহিতা	▪ দলের বিপক্ষে ভোট দিলে বা দলের পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকলে সদস্যপদ বাতিল হবে	▪ জনস্বার্থ-বিরোধী আইন পাসের বিরোধিতা করা বা নিজের দলের সমালোচনা করা সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের পক্ষে সম্ভব হয় না
জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা	▪	▪ পাঁচ বছর পর নির্বাচন ছাড়া জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই

৩. নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ওপর সাধারণ তথ্য

সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম পর্যালোচনার আগে তাদের সম্পর্কে কিছু সাধারণ তথ্য এখানে তুলে ধরা হল। নবম জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশি – সংরক্ষিত আসনসহ ২৭৩ জন (মোট সদস্যের ৭৮%)। এর পরেই রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৩৭ জন (১০.৬%), এবং জাতীয় পার্টির ২৯ জন (৮.৩%)। এছাড়া জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) তিন জন, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দু'জন করে, এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি), লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) ও স্বতন্ত্র সদস্য রয়েছেন একজন করে। বর্তমান সংসদে ১৬৩ জন (৫৪.৩%) সদস্য প্রথমবারের মত নির্বাচিত। এদের মধ্যে ১৯ জন নারী সদস্য সরাসরি নির্বাচিত (৬%), এবং ৫০ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত; ফলে এই সংসদে এখন পর্যন্ত নারী সদস্যের হার (১৯.৭%) পূর্ববর্তী যেকোনো সংসদের চেয়ে বেশি।

বর্তমান সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৮২% সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর, যেখানে ৭% এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার কম। সদস্যদের ৫৬.৫% এর পেশা ব্যবসা, যা আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে ৫৩%, এবং বিএনপি'র সদস্যদের মধ্যে ৬৯%।[৪৯] এছাড়া ১৪.৩% সদস্য আইনজীবী, ৮% চাকরিজীবী, এবং ৬.৩% কৃষিজীবী। দশজন সদস্য তাদের পেশা হিসেবে 'রাজনীতি' উল্লেখ করেন। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ১২৮ জন (৪২.৮%), এবং দশ কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে ২১ জনের (মজুমদার, ২০০৯: ৩১৭-৩২৬)।

নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৩০.৭%-এর বিরুদ্ধে মামলা চলমান ছিল; এদের ১৮ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা ছিল। একজন দণ্ডপ্রাপ্ত সদস্য আদালতের রায় নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ ছিল দুইজনের বিরুদ্ধে,[৫০] এবং তিনজন ঋণখেলাপি আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেন। বর্তমানে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত দুইজনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ গঠন প্রক্রিয়াধীন।

৪. সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম পর্যালোচনা

৪.১ সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ[৫১]

নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ৬৭% – এর মধ্যে সরকারি দলের ৫১% সদস্য ৭৫% এর বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন।[৫২] সরকারি দলের সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল দুইজন সদস্যের ২৫৩ দিন করে, এবং ১০০ দিনের কম উপস্থিতি ছিল ১২ জনের। তবে আটজন মন্ত্রী ২০০ দিনের বেশি উপস্থিত ছিলেন।[৫৩] সংসদ সদস্যদের দেরিতে উপস্থিতির কারণে নিয়মিত কোরাম সংকট দেখা যায়। নবম সংসদের প্রথম থেকে একাদশ অধিবেশন পর্যন্ত (২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে ২০১১ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত) কোরাম সংকটের মোট সময় ৭,৭৮৫ মিনিট, যার আর্থিক মূল্য ৩২ কোটি ৬৯ লাখ টাকা।[৫৪]

---

[৪৯] উল্লেখ্য, প্রথম জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ী সদস্যের হার ছিল মোট সদস্যের ২৪%, এবং আইনজীবীর হার ছিল ২৭% (২০১১ সালের ১৩ অক্টোবর সিপিডি'র 'বাংলাদেশের সংসদ: প্রতিনিধিত্ব ও দায়বদ্ধতা' শীর্ষক সংলাপে মূল প্রবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী)।

[৫০] এছাড়া ২০১০ সালের ৬ এপ্রিল সরকারি দল থেকে নির্বাচিত একজন সদস্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয় (সূত্র: *ডেইলি স্টার*, ৭ এপ্রিল ২০১০)।

[৫১] টিআইবি'র পার্লামেন্টওয়াচ গবেষণার প্রথম থেকে সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী।

[৫২] উল্লেখ্য, অষ্টম জাতীয় সংসদে ১১৩ জন সংসদ সদস্য ৫০% কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ১৮.১% মাত্র এক-চতুর্থাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। মাত্র ৭৪ জন ৭৬% বা এর বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। ১০৪ জন সদস্য অর্ধেকের বেশি কার্যদিবসে অনুপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে ৪৭ জন ছিলেন সরকারি দলের সদস্য। বিস্তরিত তথ্যের জন্য দেখুন মাহমুদ (২০০৭)।

[৫৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ জানুয়ারি ২০১২।

[৫৪] *প্রাগুক্ত*। টিআইবি'র পার্লামেন্টওয়াচ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড়ে ৪২ হাজার টাকা খরচ ধরে এই আর্থিক মূল্য প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন রোজেটি, আফরোজ ও আকতার (২০১২)।

প্রধান বিরোধী দলের ধারাবাহিক সংসদ বর্জনের কারণে বিরোধী দলের সব সদস্য ২৫% এর কম কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। বিরোধী দলের সংসদ বর্জন পূর্ববর্তী যেকোনো সংসদের চেয়ে বেশি ছিল – ২৫৪ দিনের মধ্যে বিরোধী দল উপস্থিত ছিল ৫৪ দিন, যা মোট কার্যদিবসের মাত্র ২১.২৫%। লক্ষণীয়, বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের হার ক্রমাগত বাড়ছে।[৫৫]

সংসদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড আইন প্রণয়ন। নবম সংসদের প্রথম থেকে সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত সময়ে দেখা যায় অধিবেশনের মোট সময়ের মাত্র ৯.২% আইন প্রণয়নে ব্যয় হয়েছে, যেখানে ১৩.৭% সময় ব্যয় হয় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায়। আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়ের ২৭% বিভিন্ন বিলের ওপর আপত্তি ও সংশোধনী নিয়ে আলোচনার ওপর ব্যয় হয়। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলী ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া মূল বিষয়ে বিলের ওপর সরকারি দলের সদস্যদের আপত্তি ও সংশোধনী প্রস্তাব দিতে অনাগ্রহ ছিল লক্ষণীয়। অন্যদিকে সংসদ বর্জনের কারণে এই প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল ন্যূনতম। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। এছাড়াও সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধিসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর বিল উত্থাপিত হলেও তা পাসের প্রক্রিয়ার গতি পূর্ববর্তী সংসদের মতোই ছিল মন্থর। সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়নের জন্য একজন সদস্য বেসরকারি বিল হিসেবে 'সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০০৯' উত্থাপন করেন, যা এখনো আইন হিসেবে প্রণীত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

তবে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ২৩.৮% সময় ব্যয় হয় যা সরকারের জবাবদিহিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সংসদে বিভিন্ন আলোচনায় সার্বিকভাবে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণের হার অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেন এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের ব্যাপক সমালোচনা করেন। এসব বিষয়ের মধ্যে ছিল কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর ব্যর্থতা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সমস্যা, মফস্বলে চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, বাড়িভাড়া বৃদ্ধি, পোশাকশিল্পের অস্থিরতা, ঢাকা শহরের যানজট, পুলিশের ঘুষ বাণিজ্য, এবং মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের সংসদে অনুপস্থিতি।[৫৬] আলোচনায় অংশগ্রহণের অনীহার বিষয়টি এবং তার সম্ভাব্য কারণ ২০১১-১২ সালের বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সংসদ সদস্যরাই তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন যে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীই যেকোনো পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন বলে তাঁদের কোনো মতামত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।[৫৭] মন্ত্রীদের মধ্যে বিব্রতকর প্রশ্নের জবাব না দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে।[৫৮] লক্ষণীয়, রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে সংসদে কোনো আলোচনা হয়নি।

প্রশ্নোত্তর পর্বে নারীদের মধ্যে সংরক্ষিত আসনের সদস্যরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন বলে দেখা যায়। তবে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করতে গিয়ে সংসদ সদস্যরা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেন। এক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা নিজ দলের নেতার প্রশংসা, প্রতিপক্ষ নেতার সমালোচনা, ব্যক্তিগতভাবে অসৌজন্যমূলক ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন।

সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নবম জাতীয় সংসদের বড় কৃতিত্ব প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো স্থায়ী কমিটি গঠন করা। প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা[৫৯] থাকলেও ৪৮টি কমিটি ২০১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত (অর্থাৎ ৩৫ মাসে) মোট ১,২৪৫টি এবং ১৩৬টি উপ-কমিটি ৪২৫টি বৈঠক করে।[৬০] গঠিত হওয়ার পর থেকে সবগুলো কমিটি সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত ৬৪১টি বৈঠকে নয় শতাধিক সুপারিশ করে যার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, অনেক ক্ষেত্রে কমিটি বিগত সরকারের সময়ের দুর্নীতি খতিয়ে দেখা ও সে সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নের দিকে বেশি সক্রিয় ছিল। তবে স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিরোধী দলের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল অন্যতম একটি ইতিবাচক দিক।

সার্বিকভাবে বলা যায় সংসদের মূল তিনটি কাজ – আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য সংসদ সদস্যদের ভূমিকা প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। এ প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের অংশগ্রহণও ছিল ন্যূনতম, ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি।

---

[৫৫] *প্রাগুক্ত*। উল্লেখ্য, অষ্টম, সপ্তম ও পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের হার ছিল যথাক্রমে ৬০%, ৪৩% ও ৩৪%।

[৫৬] *ডেইলি স্টার*, ১১ মার্চ, ৩১ মে, ৮ জুন, ২২ জুন ২০১১; *প্রথম আলো*, *২৬ জুন*, *৪ জুলাই ২০১২*।

[৫৭] *ডেইলি স্টার*, ২১ জুন ২০১১।

[৫৮] দেখা যায় নবম সংসদে দুই হাজারের বেশি প্রশ্ন স্থানান্তর করা হয়েছে; স্থানান্তর ও বাতিল প্রশ্নসহ মোট তামাদি প্রশ্নের সংখ্যা ১৩ হাজার ৯৬২ (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, *১৭ জুন ২০১২*)।

[৫৯] *কার্যপ্রণালী বিধির* ২৪৮ বিধি অনুযায়ী।

[৬০] জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী।

৪.২ সংসদের বাইরের কার্যক্রম

সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করার জন্য সারাদেশে সাতটি বিভাগের ৪২টি জেলায় ৪৪টি দলগত আলোচনার মাধ্যমে ঐসব জেলার ১৪৯টি আসনের সংসদ সদস্যদের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট এলাকার মোট আসনসংখ্যা ২২০। এর মধ্যে শুধুমাত্র ১৪৯টি আসনের সংসদ সদস্য সম্পর্কে দলগত আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, কারণ যেসব সদস্য সম্পর্কে আলোচকরা তথ্য জানেন না, তাদের গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়নি। আলোচিত ১৪৯টি আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে পুরুষ সংসদ সদস্য ৯৪.৬% ও নারী সদস্য ৫.৪%; এবং সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ৯১.৩% ও বিরোধীদলীয় ৮.৭%। সরকারদলীয় সদস্যদের মধ্যে মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী ২৭ জন (১৮.১%)। ১৪৯ জন সদস্যের মধ্যে ৮৬ জন সম্পর্কে পত্রিকায় নেতিবাচক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সংসদ সদস্যদের ওপর সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে নয়, বরং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা ও তথ্যের ভিত্তিতে উপাত্ত সংগৃহীত হয়। একইসাথে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদ সদস্যদের ওপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে – ইতিবাচক বা অনুকরণীয় কার্যক্রম এবং নেতিবাচক কর্মকাণ্ড। নিচে এসব কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৪.২.১ সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক বা অনুকরণীয় কার্যক্রম

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৪৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৮০ জন (৫৩.৭%) ইতিবাচক কার্যক্রমের সাথে জড়িত বলে দেখা যায়। এসব সদস্য কোনো না কোনো ধরনের ইতিবাচক কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আসনে ভূমিকা রেখেছেন। এদের মধ্যে নারী সংসদ সদস্য ছয়জন (৬.৯%), বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য পাঁচজন (৫.৭%), এবং মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী ১৯ জন (২১.৮%)।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সংসদ সদস্য (৩৫%) স্বাস্থ্য বা শিক্ষা খাতে অবদান রেখেছেন বলে দেখা যায় (চিত্র ১)। এর পরেই রয়েছে জনগণ বা বিরোধীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা (৩২.৫%), স্থানীয় অবকাঠামো নির্মাণ বা তদারকির উদ্যোগ গ্রহণ (৩১.৩%), এবং স্থানীয় সমস্যার সমাধান (১৮.৮%)। অন্যান্য কার্যক্রমের (১৭.৫%) মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান, পরিবেশ রক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অবদান রেখেছেন এমন সদস্যদের অনেকেই নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, ভূমি বরাদ্দ, অনুদান বরাদ্দ, বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ, চরাঞ্চলে চিকিৎসা সেবা, নতুন কোর্স চালু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ (এমপিওভুক্তি) ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় নিজ আসনে অবদান রাখছেন। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণ বা তদারকির ক্ষেত্রে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাস্তা, সেতু নির্মাণ বা সংস্কার প্রকল্প অনুমোদন, তদারকি, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রেলসড়ক উন্নয়ন ইত্যাদির উদ্যোগ নিয়েছেন। স্থানীয় সমস্যা সমাধানে সংসদ সদস্যদের গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প উন্নয়ন, উপকূলীয় এলাকায় জলদস্যু নিয়ন্ত্রণ ও লবণাক্ততা দূর করা, নদী ভাঙ্গন রোধ, চরমপন্থী দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, পাটকল চালু, হাওর এলাকায় ডুবন্ত রাস্তা তৈরির উদ্যোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ১: সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক কার্যক্রম (n=৮০) (একাধিক ধরনের কার্যক্রমসহ)

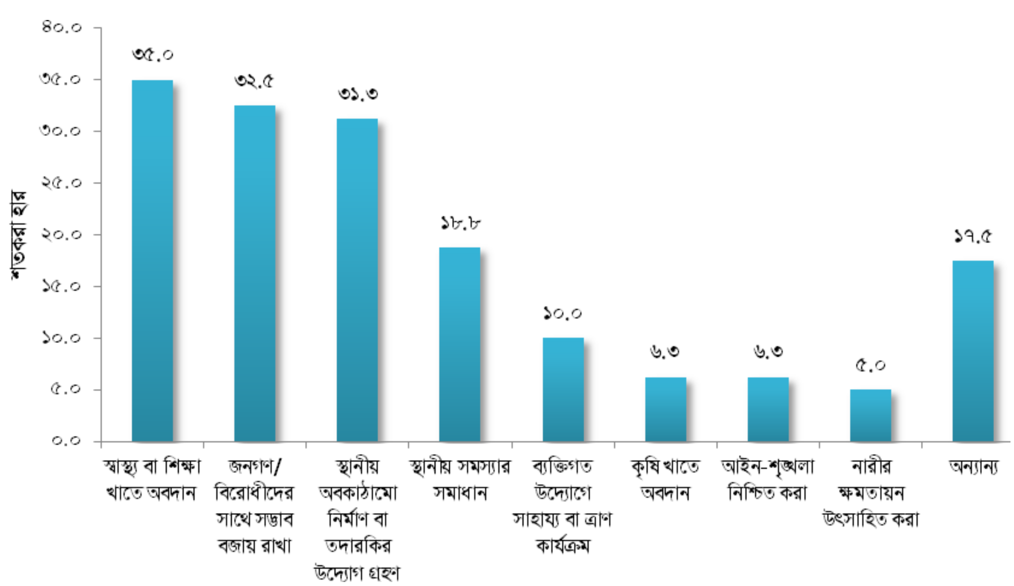

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে সরকারদলীয় একজন সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকায় একটি নাগরিক সনদ স্থাপন করেন যেন সাধারণ জনগণ তাঁর ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে পারেন।[৬১] দু'জন সংসদ সদস্য সরকারি হাসপাতালে ওষুধ চুরির পেছনে ডাক্তার-কর্মীর যোগসাজশ উদঘাটন করেন।[৬২] অপর একজন সংসদ সদস্য স্থানীয় সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে একটি কক্ষ থেকে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকার ওষুধ উদ্ধার করেন, এবং চিকিৎসকসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। তাঁর কাছে কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার রোগীদের কাছ থেকে বেশি টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে।[৬৩] এছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মঙ্গাপীড়িত এলাকার মঙ্গা দূর করা, বন্যা ও দুর্যোগপীড়িতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ এবং প্রতিশ্রুতি পূরণে কয়েকজন সংসদ সদস্য উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন।

দেখা যায় ইতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৫% সর্বোচ্চ চার ধরনের ইতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত, এবং ৫৮% এক ধরনের কার্যক্রমে জড়িত (চিত্র ২)। উল্লেখ্য, বিরোধীদলীয় ১৩ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে আটজনেরই কোনো ধরনের ইতিবাচক কার্যক্রম দেখা যায় না। এর কারণ হিসেবে দলগত আলোচনাগুলোতে একটি জেলায় সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের একচ্ছত্র আধিপত্যকে দায়ী করা হয়। বিরোধী দলে থাকার কারণে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েন এবং তাদের সুযোগ কম থাকে। এমনকি এমনও দেখা যায় একজন ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য তাঁর আসনের বাইরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী আসন যেখানে নির্বাচিত সংসদ সদস্য বিরোধীদলীয়, সেখানেও সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।

চিত্র ২: এক বা একাধিক ধরনের ইতিবাচক কার্যক্রম

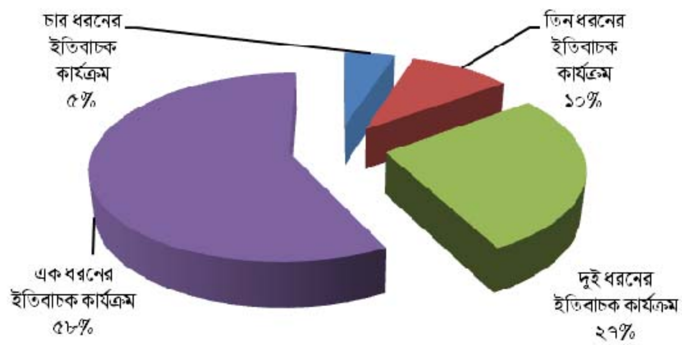

৪.২.২ সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কার্যক্রম

সাংবিধানিক দায়িত্বের বাইরে ব্যক্তিগত পেশা অথবা আইনগতভাবে নির্বাহী দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সংসদ সদস্যদের স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে হয়, এবং এই সূত্রে তাঁদের অনেকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও আইন-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৪৯ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১৪৪ জন (৯৭%) এক বা একাধিক নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত বলে দলগত আলোচনা থেকে পাওয়া যায় (চিত্র ৩)। নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সদস্যদের মধ্যে নারী সদস্য সাতজন, মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীদের সবাই, এবং বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য ১২ জন।

চিত্র ৩: নেতিবাচক কার্যক্রমের অভিযোগ আছে এমন সংসদ সদস্যের হার (১৪৯ জনের মধ্যে)

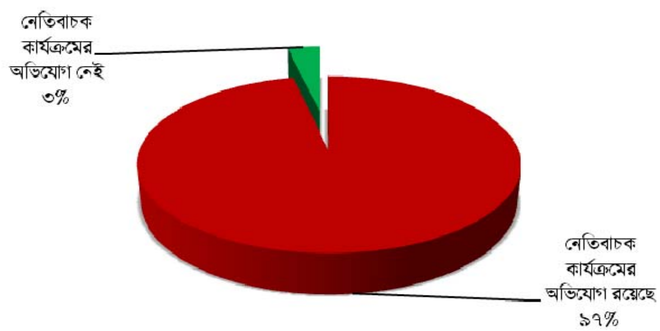

[৬১] *ডেইলি স্টার*, ১ নভেম্বর ২০১০।
[৬২] *ডেইলি স্টার*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১।
[৬৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ জুলাই ২০১২।

বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় নেতিবাচক কার্যক্রমের অভিযোগ রয়েছে এমন সংসদ সদস্যের ৮১.৮%-এর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কাজে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে; এর পরেই রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ (৭৬.৯%), উন্নয়ন বরাদ্দ অপব্যবহার (৭৫.৫%), বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম (৭০.৬%), সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার (৬৯.২%), এবং নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের (৬২.২%) অভিযোগ (চিত্র ৪)। দেখা যায়, কোনো কোনো সংসদ সদস্য একাধিক ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িত (চিত্র ৫)।

চিত্র ৪: সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ধরন (n=১৪৪) (একাধিক ধরনের কার্যক্রমসহ)

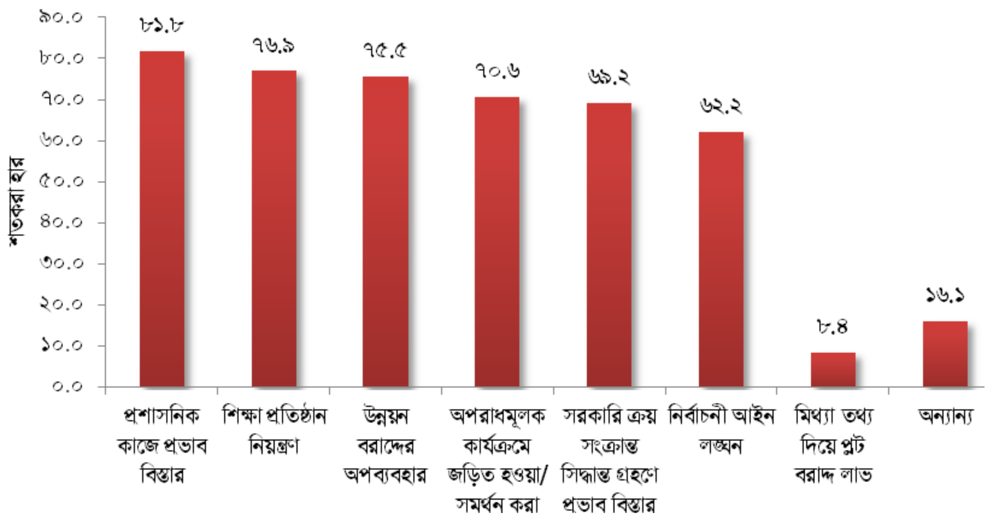

বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৪৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৮৬ জন সম্পর্কে (৫৭.৭%) বিভিন্ন নেতিবাচক কার্যক্রম নিয়ে জাতীয় সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।[৬৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ের দৈনিক সংবাদপত্রে ২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে ২০১২ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নবম সংসদের যে ১৮১ জন সদস্যের বিভিন্ন নেতিবাচক কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে বিরোধী দলের সদস্য ৫.৯%, এবং নারী সদস্য ১১.৭% যাদের মধ্যে সংরক্ষিত আসনের নয়জন রয়েছেন।[৬৫]

চিত্র ৫: এক বা একাধিক ধরনের অভিযোগ থাকার হার

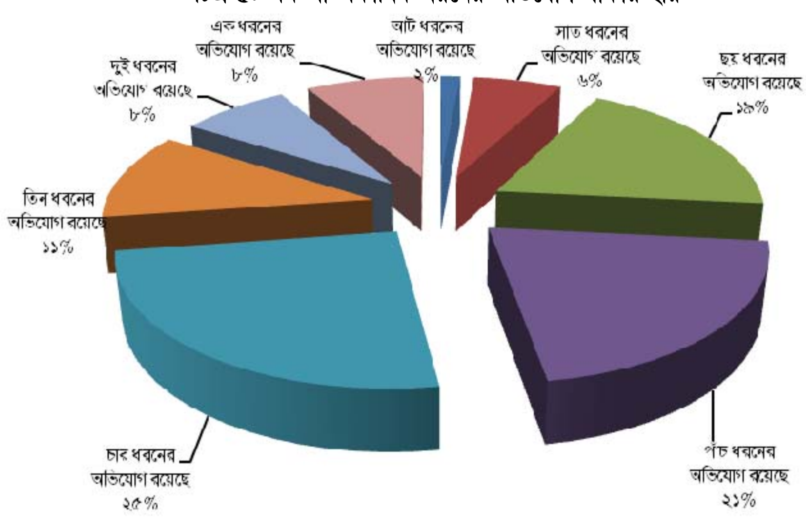

[৬৪] মাঠ পর্যায়ের তথ্যের সাথে এই পার্থক্যের সম্ভাব্য কারণ স্থানীয় সকল সংবাদ জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না।

[৬৫] উল্লেখ্য, এই নারী সদস্যদের মধ্যে আটজনের বিরুদ্ধে উন্নয়ন বরাদ্দ অপব্যবহার এবং পাঁচজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্লট লাভের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

নিচে দলগত আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের ধরন নিয়ে আলোচনা করা হল।

৪.২.২.১ *প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রভাব সৃষ্টি*
গবেষণার বিশ্লেষণ অনুযায়ী নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৮১.৮% প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রভাব সৃষ্টি করেন, যদিও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সংসদ সদস্যদের প্রতি নির্দেশ ছিল প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ না করার।[৬৬] প্রশাসনিক কাজে প্রভাব সৃষ্টির মধ্যে স্থানীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মেডিকেল কলেজ, মৎস্য অধিদপ্তর, সার কারখানা, এবং প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে সুপারিশ ও বলপ্রয়োগ। খুব কম ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে, আবার পাল্টা মামলাও করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বদলি করে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের চাপে।

৪.২.২.২ *শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ*
গবেষণায় দেখা যায়, নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৭৬.৯% স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। ক্ষমতার অপব্যবহারের ধরনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটি নিয়ন্ত্রণ ও সংসদ সদস্যের নিজের পছন্দের সদস্য নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ, অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেওয়া, কমিশনের বিনিময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও-ভুক্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ অপব্যবহার, বরাদ্দ পেতে দুর্নীতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসব অনিয়ম করতে গিয়ে শিক্ষক লাঞ্ছনার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

উল্লেখ্য, নবম সংসদ নির্বাচনের পর থেকে সরকারদলীয় সংসদ সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিও-ভুক্ত (Monthly Payment Order) করার দাবি জানাতে থাকেন। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে সারা দেশে প্রথমে ১,০২২টি, এবং সংসদ সদস্যদের ব্যাপক সমালোচনা ও চাপের মুখে এ সংখ্যা বাড়িয়ে মোট ১,৬২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিও-ভুক্ত করা হয়।[৬৭] পরবর্তী বছরে সংসদ সদস্যদের দাবির প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি আরও ১,৪০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিও-ভুক্ত করার সুপারিশ করে।[৬৮] এছাড়া ৩,০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ২,১১৪ কোটি ৮০ লাখ ৪৪ হাজার টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়, যেখানে প্রত্যেক সংসদ সদস্যের পছন্দ অনুযায়ী দশটি করে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করা হবে।[৬৯] এমপিও-ভুক্ত করার জন্য প্রত্যেক সংসদ সদস্যের পছন্দের তিনটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম চাওয়া হয়,[৭০] এবং পরবর্তীতে তহবিল পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে এসব প্রতিষ্ঠান এমপিও-ভুক্ত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৭১]

৪.২.২.৩ *উন্নয়ন বরাদ্দের অপব্যবহার*
আলোচকদের তথ্য অনুযায়ী নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৭৫.৫% স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন বরাদ্দ নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন। অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবহার বা তদারকি না করা, স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুবিধা নেওয়া, স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলের নেতা-কর্মীদের প্রাধান্য দেওয়া, এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে কমিশন আদায় করা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সদস্যরা প্রকল্প অনুমোদন ও তদারকিতে প্রভাব সৃষ্টি, ভুয়া প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ, টিআর-কাবিখা-কাবিটা বিতরণ ও ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম করেন। ভুয়া প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে অস্তিত্বহীন বাঁধ পুনর্নির্মাণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংস্কার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন মসজিদ, মন্দির, শ্মশান, কবরস্থান, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, পূজামণ্ডপ, গীর্জা ইত্যাদি সংস্কার, রাস্তা পুনর্নির্মাণ, এবং ভুয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ক্লাব, পাঠাগার, ব্লাড ব্যাংক, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, এবং বিভিন্ন সমিতি, যাদের নামে এসব বরাদ্দ নেওয়া হয়।

দেখা যায়, উন্নয়ন বরাদ্দ অপব্যবহারকারী সংসদ সদস্যদের ৭৮.৭% এসব বরাদ্দ অনুমোদন দিতে গিয়ে কমিশন আদায় করেন। কমিশনের হার কমপক্ষে ৫%। একটি আসনে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত বডিগার্ড প্রতিটি প্রকল্পে ৬০% কমিশন চান; যার ফলে তার নাম হয়েছে '৬০% কমিশনের এমপি'। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে বেশি কমিশন দিতে পারে সেই কাজ পায়, দল এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়।

৪.২.২.৪ *অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত হওয়া বা সমর্থন করা*
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৭০.৬% বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতির সাথে জড়িত। এর মধ্যে হত্যার অভিযোগ ছিল পাঁচজনের বিরুদ্ধে। এছাড়া দখল (সরকারি খাস জমি, নদী, খাল, জলমহাল, পুকুর),

---

[৬৬] *ডেইলি স্টার*, ৫ জুন ২০০৯)। আওয়ামী লীগের সংসদীয় কমিটির সভায় তিনি দলীয় সংসদ সদস্যদের এ নির্দেশ দেন।

[৬৭] *ডেইলি স্টার*, ২ জুন ২০০৯।

[৬৮] *ডেইলি স্টার*, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৯।

[৬৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

[৭০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ জুন ২০১১।

[৭১] ২০১২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংসদে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষামন্ত্রী এ তথ্য দেন।

চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, প্রতারণা, মাদক ব্যবসা, চোরাচালান ইত্যাদি ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়। অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত অভিযোগ রয়েছে এমন সদস্যের ৫৩.৫% নিজেই বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে আলোচনায় উঠে এসেছে, এবং প্রায় সবক্ষেত্রেই স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় নেতা-কর্মীরা এসব অপরাধের সাথে জড়িত। দেখা যায় এসব সংসদ সদস্যের ২৪.১%-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মামলা করার সাহস পায় না, অথবা সংসদ সদস্যদের প্রভাব এত বেশি যে তাদের অনুমতি ছাড়া থানা মামলা নেয় না।

৪.২.২.৫ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার

নেতিবচিক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৬৯.২% স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ক্রয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করেন বলে আলোচনায় উঠে এসেছে। দেখা যায় এসব সদস্য জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকলেও এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), সড়ক ও জনপথ (সওজ), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) ইত্যাদি।

এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ শুরু হয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে। সাধারণত যে দল যখন ক্ষমতায় আসে তখন সেই দলের সংসদ সদস্যরা এই প্রভাব খাটিয়ে থাকেন। দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সরকারি ক্রয় নিয়ন্ত্রণকারী সংসদ সদস্যদের ৭১.৭%-এর হয় নিজের অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অথবা অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে ঠিকাদারি ব্যবসা পরিচালনা করেন। সাধারণত তারা বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় কিন্তু রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে নিয়ে আসেন।[৭২] পরবর্তীতে ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের সময় সংসদ সদস্য নিজে বা তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা দলের নেতা-কর্মীরা এটি নিয়ন্ত্রণ করে। আলোচনায় দেখা গেছে প্রায় ৮৯% ক্ষেত্রে একটি আসনের উন্নয়নমূলক কাজ পায় ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী; বাকি ক্ষেত্রেও কমিশনের বিনিময়ে কাজ দেওয়া হয়। দরপত্র কিনতে বা জমা দিতে বাধা দেওয়া, সমঝোতার মাধ্যমে কাজ বন্টন, কমিশনের বিনিময়ে কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প'-এ এক হাজার ১৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নের জন্য চলতি অর্থবছরে ৭০টি চলমান প্রকল্পের জন্য চার হাজার ৮৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।[৭৩]

আইনগতভাবে সরকারের সঙ্গে কোনো ব্যক্তির ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকলে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বা থাকার যোগ্য হবেন না[৭৪] বলা হলেও দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত একজন সংসদ সদস্যের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরকারের সাথে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন ২০১২ এর ১০ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন ও সংসদ সচিবালয়কে চিঠি দিয়ে ঐ আসনের সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু স্পিকারের মতে এই সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের এখতিয়ার দুদকের নেই; এই এখতিয়ার শুধু সংসদের। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনেরও করার কিছু নেই বলে জানায় নির্বাচন কমিশন।[৭৫]

৪.২.২.৬ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৬২.২% এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ এসেছে। এর মধ্যে প্রার্থীকে মৌখিকভাবে মনোনয়ন দেওয়া, দলীয়ভাবে সমর্থন, অর্থের বিনিময়ে সমর্থন, নির্বাচনের

---

[৭২] উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ২০১১-১২ অর্থবছরের মূল এডিপি'তে প্রকল্প ছিল ১,০৩৯টি, কিন্তু ৮০০টি প্রকল্প বরাদ্দহীন ও অননুমোদিতভাবে এডিপি'তে রাখা হয়। এসব প্রকল্প থেকে ১৮৯টির অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩৫টি নতুন প্রকল্পসহ মোট ১,০৩৭টি চূড়ান্ত, তবে বরাদ্দহীন অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে আরও এক হাজার ৪৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের চাপে যোগাযোগ খাতেই প্রকল্প রয়েছে ১৭০টি (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ জুন ২০১২)।

[৭৩] স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ২০১২ এর ৫ সেপ্টেম্বর সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে একথা জানান (সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২)।

[৭৪] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯*, ধারা ১২(১)(ট)।

[৭৫] *কার্যপ্রণালী বিধির* ১৮৮ বিধি অনুযায়ী সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আর্থিক, প্রত্যক্ষ বা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেচিত হতে পারে এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যকে কমিটির সদস্য করা যায় না। অথচ বর্তমান সংসদে অন্তত ২০ জন সদস্য ছিলেন বা রয়েছেন যারা এ বিধি লঙ্ঘন করে স্থায়ী কমিটির সদস্য হয়েছেন। অর্থ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, যোগাযোগ, নৌ-পরিবহন, শ্রম ও কর্মসংস্থান, বস্ত্র ও পাট, বাণিজ্য ইত্যাদি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ক্ষেত্রে এই বিধি পালিত হয়নি (সূত্র: *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২ সেপ্টেম্বর ২০১০)। পরবর্তীতে কয়েকটি ঘটনা প্রকাশিত হয় যেখানে একটি সংসদীয় কমিটির সভাপতি বা সদস্য হিসেবে স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন সংসদ সদস্যের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঐ সংক্রান্ত কাজ পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বন্দর, এবং রাজশাহী সিটি করপোরেশনের কথা উল্লেখ করা যায়।

ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করা উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, নবম সংসদ গঠিত হওয়ার পর সারা দেশে ৪,২৮৫টি ইউনিয়ন পরিষদ, ২৬২টি পৌরসভা, ৪৮১টি উপজেলা পরিষদ এবং তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে সংসদ সদস্যদের অনিয়ম শুরু হয় নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই। একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রার্থী বিভিন্নভাবে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেন, যাদের অনেকেই সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এসব আচরণ বিধি লঙ্ঘনের মধ্যে তফসিল ঘোষণার আগে থেকে প্রচারণা চালানো (আকরাম ও দাস, ২০০৭),[৭৬] নির্ধারিত সময়ে ও বেশি সময় ধরে মাইকিং ও অতিরিক্ত মাইক ব্যবহার, দেয়ালে পোস্টার টানানো, রঙ্গিন পোস্টার ছাপানো, মোটর সাইকেল বা বাস র‍্যালি, ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণ, ভোটার ও কর্মীদের আপ্যায়ন, এবং নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত ব্যয় উল্লেখযোগ্য। একটি গবেষণায় (আকরাম ও দাস, ২০০৯) দেখা যায় ৪০টি আসনে ৮৮ জন প্রার্থী গড়ে প্রায় ৪৪ লাখ ২০ হাজার ৯৭৯ টাকা ব্যয় করেন যেখানে একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ের অনুমতি ছিল।[৭৭]

৪.২.২.৭ *মিথ্যা তথ্য দিয়ে বা তথ্য গোপন করে প্লট বরাদ্দ লাভ*

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের ৮.৪% মিথ্যা হলফনামার ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন বলে দেখা যায়।[৭৮] তাদের মধ্যে বর্তমান ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিও রয়েছেন, এবং এদের ঢাকা শহরে নিজের বা স্ত্রীর নামে একাধিক জমি ও ফ্ল্যাট রয়েছে।

৪.২.২.৮ *অন্যান্য অনিয়ম*

নেতিবাচক কার্যক্রমে জড়িত সংসদ সদস্যদের অন্যান্য ধরনের অনিয়মের (১৬.১%) মধ্যে রয়েছে সাংবাদিক নির্যাতন ও হয়রানি, হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা, সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার,[৭৯] ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষমতার দাপট দেখানো, নিজ সংসদীয় আসনে অশ্লীল যাত্রা ও জুয়ার আসর বসানো, বিচার কার্যে হস্তক্ষেপ, প্রতারণা, সাধারণ জনগণকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া ইত্যাদি।

৪.২.৩ সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্টির মাত্রা

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে চারটি নির্দেশকের ওপর ভিত্তি করে সন্তুষ্টির মাত্রা জানতে চাওয়া হয়। সন্তুষ্টির সর্বনিম্ন মান ১ থেকে সর্বোচ্চ ১০ ধরে এতে সার্বিকভাবে স্কোর আসে ৪.১৮ (চিত্র ৬)। এতে দেখা যায় বিরোধীদলীয় সদস্যরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ, সংসদে এলাকার প্রতিনিধিত্ব বা স্থানীয় কার্যক্রমের উদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও জনগণের সাথে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছেন। আরও উল্লেখ্য, ৬৮.৪৫% সংসদ সদস্যই ৫-এর নিচে স্কোর পেয়েছেন, যেখানে ৩.৩৬% ৭.৬ বা তার বেশি স্কোর পেয়েছেন।

---

[৭৬] গবেষণায় দেখা যায় ৩৮টি আসনে ১২২ জন প্রার্থী তফসিল ঘোষণার আগেই নির্বাচনী প্রচারণা বাবদ গড়ে ১৫ লাখ ২০ হাজার টাকার বেশি খরচ করেন।

[৭৭] এদের মধ্যে জয়ী প্রার্থীরা অর্থাৎ যাঁরা সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা গড়ে ৪৫ লাখ ৬৯ হাজার ৮০৪ টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু প্রার্থীদের দাখিলকৃত রিটার্ন নিরীক্ষা করে দেখা যায় সবাই নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যেই তাদের ব্যয় দেখিয়েছেন, যার গড় ১০ লাখ ৭ হাজার ৯২০ টাকা।

[৭৮] সার্বিকভাবে নবম জাতীয় সংসদের ২৮ জন সদস্য মিথ্যা তথ্য দিয়ে বা তথ্য গোপন করে সরকারিভাবে প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন। এদের ১৪ জন আওয়ামী লীগ, দু'জন জাতীয় পার্টি, একজন বিএনপি ও একজন জাসদের সংসদ সদস্য। এদের ১৮ জন উত্তরা সম্প্রসারিত তৃতীয় প্রকল্প এবং দশ জন পূর্বাচল উপশহর প্রকল্পে প্লট পেয়েছেন। উল্লেখ্য, অষ্টম সংসদে ৫৫ জন সদস্য মিথ্যা হলফনামার ভিত্তিতে বনানীতে প্লট বরাদ্দ পেয়েছিলেন। (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ জানুয়ারি ২০১০)।

[৭৯] ২০১১ সালের মার্চ পর্যন্ত বর্তমান সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১৪৫ জনের টেলিফোনের বিল বকেয়া ছিল ছয় লাখ ৯৭ হাজার ১৪১ টাকা। (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ জুন ২০১১)। উল্লেখ্য, সপ্তম ও অষ্টম সংসদের ২১ জনের টেলিফোন বিল এখনো বকেয়া রয়েছে, যার মোট পরিমাণ ৩৮ লাখ ছয় হাজার ৩২৩ টাকা (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ মার্চ ২০১২)। কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের জন্য বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাটে বহিরাগতদের বসবাসের সুবিধা দিয়েছেন ৬৪ জন, এবং ৬৬ জন ফ্ল্যাটের বরাদ্দ নিয়েও থাকেন না (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ ডিসেম্বর ২০১০; *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ আগস্ট ২০১১)।

চিত্র ৬: সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্টির মাত্রা (স্কোর সর্বনিম্ন ১ থেকে সর্বোচ্চ ১০)

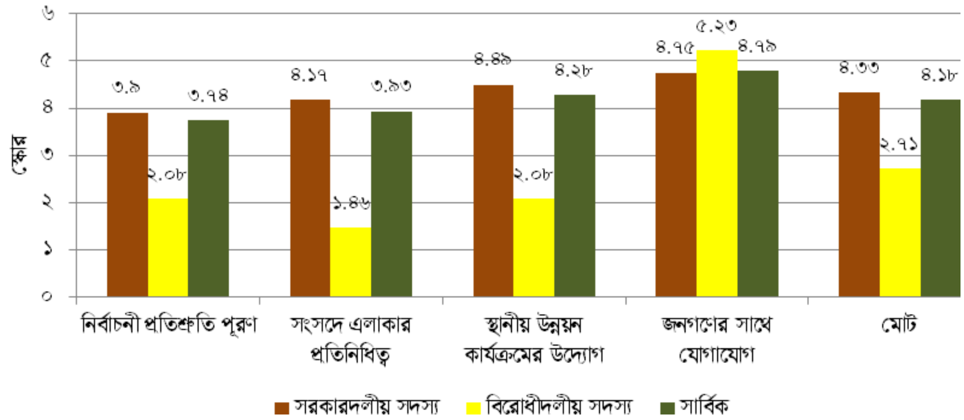

৫. সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদের ওপর প্রদত্ত নির্বাহী দায়িত্ব তাদের ওপর সাংবিধানিকভাবে অর্পিত দায়িত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সংযুক্ত থাকার ফলে সংসদ সদস্যদের জন্য এই প্রতিনিধিত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে খুবই লোভনীয়। এছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান ব্যবস্থায় সরকার গঠনকারী দল একটি কার্যকর ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার অভাবের কারণে ঈর্ষণীয় পর্যায়ের ক্ষমতা ভোগ করেন যার ফলে 'বিজয়ীরাই সবকিছু ভোগ করবে' – এ ধরনের মানসিকতার উদ্ভব ঘটেছে। এর ফলে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা একেবারেই সংকুচিত হয়ে গিয়েছে, এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা খুবই নগণ্য যার প্রমাণ আমরা সাম্প্রতিক সংসদগুলোর ক্ষেত্রে দেখতে পাই। বাংলাদেশে বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রত্যাহার (recall), বা সংসদীয় দলের বিশেষ সভা (special meeting) করার চর্চা নেই। ফলে পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন ব্যতিরেকে ভোটারদের কাছে সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতার সুযোগ সীমিত। নিচে সংসদ সদস্যদের কর্মকাণ্ডের পেছনের সম্ভাব্য কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫.১ সংসদ সদস্যপদকে 'আয়ের উৎস' হিসেবে ব্যবহার

'সংসদ সদস্যপদ'কে একটি লাভজনক আয়ের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। সংসদ সদস্যপদের সাথে প্রকল্প এনে দেওয়া, সুবিধাভোগী নির্বাচন করা, স্থানীয় নানা প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব করা, কাজ ও চাকরি পাইয়ে দেয়া, নিজের ব্যবসার জন্য কাজ আনা প্রভৃতি সুবিধা ও ক্ষমতা থাকে বলে এই পদ বিশেষ আকর্ষণীয় এবং অধিকাংশ সংসদ সদস্য এর সদ্ব্যবহার করেন। এই সুবিধা ও ক্ষমতার সাথে দুর্নীত যুক্ত হয়ে পদটি আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া দলীয় নেতা-কর্মীদের স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন সংসদ সদস্যরা। এ ধরনের স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ দান পরবর্তী নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের পক্ষে সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য এক ধরনের বিনিয়োগও বটে।

৫.২ কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে সংসদ সদস্যরা শুধু দলের কাছে দায়বদ্ধ থাকার ফলে তাদের কাছে দলের অবস্থান বা সিদ্ধান্ত অগ্রাধিকার পায়। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়বদ্ধতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন আর্থিক (আয়-ব্যয়, সম্পদ, আয়কর, ঋণ, অপ্রদর্শিত অর্থ) ও অন্যান্য তথ্য (মামলা, উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবহার) প্রকাশের কোনো আইনি বিধান না থাকার ফলে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে সংসদের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জনগণের কাছে কোনো তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য থাকেন না। এমনকি তথ্য অধিকার আইনের অধীনেও সংসদ সদস্যরা তথ্য দিতে বাধ্য নন।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ততা, মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও প্রভাব আইনগতভাবে স্বীকৃত থাকার কারণে উপজেলা পর্যায়ে সংসদ সদস্যরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এর ফলে একদিকে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারছে না, আর অন্যদিকে এটি সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের জন্য পরবর্তী নির্বাচনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার সুযোগ, যার অপব্যবহার করার সুযোগ নেন অনেক সদস্য।

বর্তমান আইন অনুসারে সংসদ সদস্যপদের যোগ্যতা না থাকার কারণে কোনো সদস্যের সদস্যপদ বাতিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (নির্বাচন কমিশন বা সংসদ) এখতিয়ার সুস্পষ্ট নয়। এর ফলে এ ধরনের পরিস্থিতির সুযোগে অভিযুক্ত সংসদ

সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো উদাহরণ তৈরি হচ্ছে না। দেখা যায় আদালতের নির্দেশ ছাড়া সংসদ সদস্যদের সদস্যপদ বাতিল করার কোনো ব্যবস্থা নেই, এবং এই প্রক্রিয়াও অত্যন্ত ধীরগতির। নবম সংসদ নির্বাচনে তথ্য গোপন করে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন পাঁচজন সদস্য – তাঁরা সরকারের বিভিন্ন লাভজনক পদে থেকেই নির্বাচন করেন। এদের বিরুদ্ধে করা মামলার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে তিনজনের সদস্যপদ বাতিল হয়েছে, যার দু'টি আসনে নতুন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, এবং আরেকটি আসনে উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে। বাকি মামলাগুলো এখনো চলমান রয়েছে।

সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি এবং বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ট্রেজারি বেঞ্চের (মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী) একচ্ছত্র আধিপত্য লক্ষ করা যায়। এ কারণে ব্যাকবেঞ্চার ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে সীমিত, যা সংসদের ভারসাম্য নষ্ট করে। আনুপাতিক হারে অন্তর্ভুক্তির কারণে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমিত। ফলে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে তাদের জন্য সুযোগের অভাব লক্ষণীয়।

৫.৩ দলীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অনুপস্থিতি

প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। সবগুলো বৃহৎ রাজনৈতিক দলে স্থানীয় পর্যায়ে দীর্ঘদিন কমিটি না হওয়া, সম্মেলন না হওয়া, পরবর্তী নেতৃত্ব তৈরি না হওয়া ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান (আকরাম ও অন্যান্য, ২০১০)। দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চার ঘাটতির কারণে সংসদ সদস্যরা নিজ দলের সমালোচনার জন্য দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে অসহনশীল আচণ, তিরস্কার থেকে শুরু করে দল থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক অঙ্গনে অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কারণে অগণতান্ত্রিক আচরণ বৃদ্ধি পায় এবং ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতা-কর্মীরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

৫.৪ 'শাস্তি না হওয়ার সংস্কৃতি'র (culture of impunity) বিকাশ

সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে 'শাস্তি না হওয়ার সংস্কৃতি' বিকশিত হয়, যার ফলে সংসদ সদস্যরা নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়েন না (লিটন, ২০১২)। দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগের ক্ষেত্রে অস্বীকার করার প্রবণতা শাস্তি না হওয়ার সংস্কৃতিকে আরও উৎসাহিত করছে। প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্যদের খারাপ আচরণের বিরুদ্ধে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি।[৮০]

চিত্র ৬: সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণ

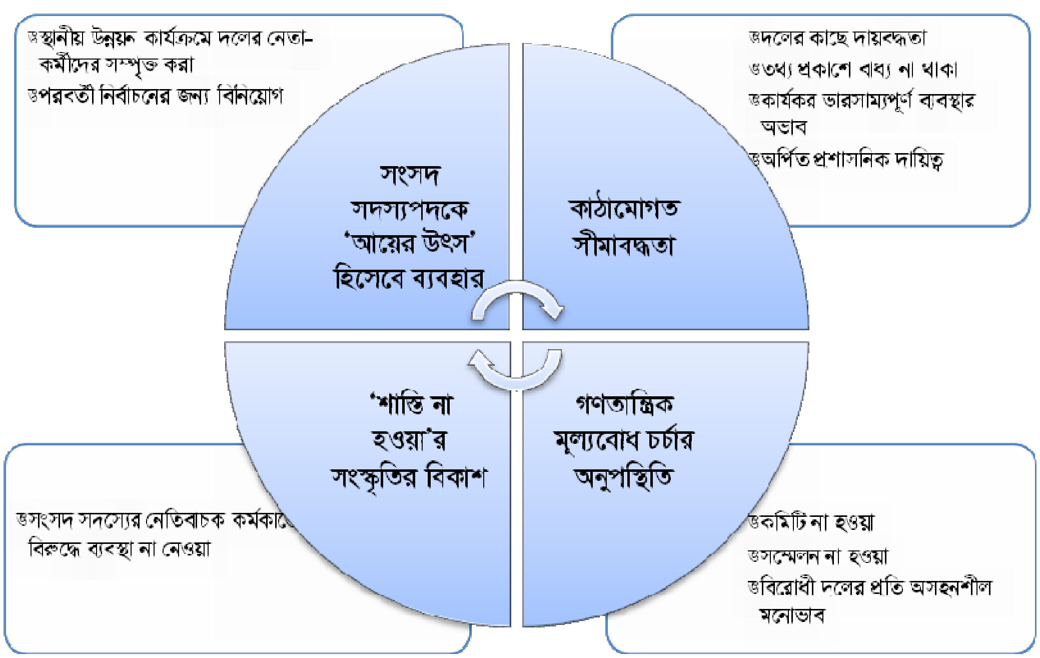

[৮০] আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ১৭৫ আসনে আওয়ামী লীগের অবস্থা ভাল বলে জানান এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দেন। তবে নিজ সংসদীয় আসনে জনগণের সাথে ভাল ব্যবহার করার পরামর্শ দেন দলের সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (সূত্র: *প্রথম আলো*, *১২ জুন ২০১২*)।

অন্যান্য অনেক দেশে সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের টেলিকম খাতে কেলেংকারির অভিযোগে ভারতের সাবেক টেলিকম মন্ত্রী ও একজন সংসদ সদস্যসহ ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই কেলেংকারির কারণে ঐ দেশের প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হওয়ার আশংকা করা হয়। ভারতের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, জালিয়াতি, ঘুষ গ্রহণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ গঠন করে।[৮১] এছাড়া ২০০৮ সালের আস্থাভোটের সময় অন্যান্য সংসদ সদস্যদের অর্থের বিনিময়ে 'ভোট কেনা'র প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে বিরোধীদলীয় একজন সংসদ সদস্যসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয় ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে।[৮২] আরেকটি ঘটনায় ভারতের বিধানসভার স্পিকার দুইজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেন।[৮৩] সম্পদের হিসাব না দেওয়ায় পাকিস্তানে ২২২ জন সংসদ সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ ও দেনার হিসাব জমা না দেওয়ায় এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।[৮৪] যুক্তরাজ্যে ২০০৯ এর ১৯ মে হাউজ অব কমন্স-এর স্পিকার মাইকেল মারটিন সংসদ সদস্যদের ব্যয় কেলেংকারির জন্য পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। *দি ডেইলি টেলিগ্রাফ*-এ সংসদ সদস্যদের জনগণের অর্থে নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের সংবাদ প্রকাশের পর দুই প্রধান দল থেকেই এসব সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা গর্ডন ব্রাউন বলেন যেসব সংসদ সদস্য ব্যয় সংক্রান্ত বিধি ভঙ্গ করেছেন তাদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হবে না।

৬. উপসংহার ও সুপারিশ

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় বাংলাদেশের সংসদ সদস্য সংক্রান্ত সাংবিধানিক ও আইনি বিধি-বিধানে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংসদ সদস্য হিসেবে বিভিন্ন আর্থিক ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা না থাকা, সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি না থাকা, সংসদে ৮৯ কার্যদিবস পর্যন্ত অনুপস্থিতির অনুমোদন, দলের বিপক্ষে ভোট দিলে বা দলের পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকলে সদস্যপদ বাতিল, উপজেলা পরিষদে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকা, এবং সার্বিকভাবে জনগণের কাছে জবাবদিহি করার কোনো ব্যবস্থা না থাকা।

দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো সংসদ সদস্য তাঁদের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে পালন করলেও সংসদ সদস্যদের একটি বিরাট অংশ সংসদ ও সংসদের বাইরে বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িত। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন বরাদ্দের অপব্যবহার, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার, অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত হওয়া, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ, এবং তথ্য গোপন করে সুবিধা আদায়। দেখা যায় এসব নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সরকারদলীয়-বিরোধীদলীয়, নারী-পুরুষ, মন্ত্রিসভার সদস্যপদ ইত্যাদি বিষয় কোনো প্রভাব ফেলে না।

সংসদ সদস্যদের এসব নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের পেছনে যেমন সংসদ সদস্যপদকে আয়ের উৎস হিসেবে গণ্য করা ও একে ব্যবহার করে স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া কারণ হিসেবে কাজ করে, তেমনি এর পাশাপাশি কিছু কাঠামোগত কারণ (যেমন দলের কাছে দায়বদ্ধতা, তথ্য প্রকাশে বাধ্যবাধকতা না থাকা, সংসদে কার্যকর ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার অভাব ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ), দলীয় রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অনুপস্থিতি, এবং 'শাস্তি না হওয়ার' সংস্কৃতি কাজ করে।

সংসদে সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হল।

ক. সংসদে কার্যকর অংশগ্রহণ বাড়ানো

১. সংসদ সদস্যদের স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে যেন তারা তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব আরও আন্তরিকতার সাথে পালন করতে পারে। এজন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন থেকে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বন্ধ করতে হবে।

---

[৮১] *ডেইলি স্টার*, ২১ মে ও ১২ নভেম্বর ২০১১।

[৮২] *ডেইলি স্টার*, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১।

[৮৩] তাদের বিরুদ্ধে অধিবেশন চলাকালীন পর্নোগ্রাফি দেখার অভিযোগ উত্থাপিত হয় (সূত্র: *ডেইলি স্টার*, ২২ মার্চ ২০১২)।

[৮৪] এসব সংসদ সদস্যদের মধ্যে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীসহ ডজনখানেক মন্ত্রী রয়েছেন। আইন অনুসারে প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সম্পদ ও দেনার হিসাব জমা দিতে হয়। যারা হিসাব দিতে ব্যর্থ হয় ১৫ অক্টোবরের মধ্যে কমিশনকে তাদের নাম প্রকাশ করতে হয় (সূত্রঃ *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৪ অক্টোবর ২০১১)। এর আগের বছর একই কারণে ১৪৮ জন সংসদ সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত করা হয় (সূত্রঃ *ডেইলি স্টার*, ১৯ অক্টোবর ২০১০)।

২. সংসদ বর্জন আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে। সংসদ সদস্যদের সংসদে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান ৯০ দিনের অনুমোদন কমিয়ে নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়া সর্বোচ্চ ৩০ দিন এবং একটানা সাতদিনের বেশি অনুপস্থিত থাকা নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩. বিরোধী দলের কার্যকর এবং ন্যায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন, দল থেকে ডেপুটি স্পিকারের পদত্যাগ এবং পরবর্তী নির্বাচনে একই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে নির্বাচনের সুযোগ করে দিতে হবে। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্তত ৫০% সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করতে হবে।

৪. নিজ দল থেকে স্পিকারের পদত্যাগ এবং পরবর্তী নির্বাচনে একই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে নির্বাচনের সুযোগ করে দিতে হবে।

৫. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে। অনাস্থা প্রস্তাব, জাতীয় বাজেট, এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু বিষয় ছাড়া অন্যান্য যেকোনো বিষয়ে দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

খ. নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা

৬. সকল রাজনৈতিক দলে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা বিকশিত করতে হবে। সংসদ সদস্যদের জন্য জাতীয় সংসদে উত্থাপিত 'আচরণ বিধি' বিল আইনে পরিণত করতে হবে।

৭. সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। এর পাশাপাশি সংসদ সদস্যের নিজ রাজনৈতিক দল থেকেও শক্তিশালী ভূমিকা নিতে হবে। বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সংসদ সদস্যদের দল থেকে বহিষ্কার এবং পরবর্তী নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। প্রত্যাশিত পর্যায়ে কাজ না করার জন্য সংসদ সদস্যকে প্রত্যাহার (recall) বা বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা (special meeting) করার বিধান করতে হবে।

৮. সংসদ সদস্যদের আর্থিক (আয়-ব্যয়, সম্পদ, ঋণ, আয়কর ইত্যাদি) ও অন্যান্য তথ্য (মামলা, নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়ন বরাদ্দ ব্যবহার ইত্যাদি) নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে, এবং সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে জনগণ যেন তথ্য পেতে পারে তার জন্য তথ্য অধিকার আইন সংশোধন করতে হবে। সকল সংসদ সদস্যের সংসদ অধিবেশন ও সংসদীয় কমিটিতে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।

৯. সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে, এবং এ কাজটি করতে হবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর আগে থেকেই। নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রার্থীদের সম্পর্কে তুলনামূলক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে যেন জনগণ তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ কাজে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজের সদস্য ও প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সংবাদ-মাধ্যমকেও উদ্যোগ নিতে হবে।

১০. স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যেতে পারে, যেখানে খোলাখুলিভাবে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের বিষয়ে জনগণ জানতে পারবে এবং মতামত দিতে পারবে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজ ও প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগ নিতে হবে।

****

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

আকরাম, শম, দাস, সদ, মনজুর-ই-খোদা, শারমীন, ন ও শারমিন, র ২০১০, *জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা*, টিআইবি, ঢাকা।

আকরাম, শম, দাস, সদ, ও মাহমুদ, ত ২০০৮, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, টিআইবি, ঢাকা।

আকরাম, শম, ও দাস, সদ ২০০৭, 'নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা: স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের ওপর একটি বিশ্লেষণ', টিআইবি, ঢাকা।

আকরাম, শম, ও দাস, সদ ২০০৯, *নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিরীক্ষা: প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ওপর একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ*, টিআইবি, ঢাকা।

আকরাম, শম, দাস, সদ, আফরোজ, ফ ও শারমিন, র ২০১২, *সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*, টিআইবি, ঢাকা।

জাহান, র ২০১১, 'বাংলাদেশের সংসদ: প্রতিনিধিত্ব ও দায়বদ্ধতা', ২০১১ সালের অক্টোবরে সিপিডি'র সংলাপে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

নজরুল, আ ২০১২, 'মন্ত্রীরা কখনো দুর্নীতি করেন না', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ জুন।

ফিরোজ, জ ২০০৩, *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

মজুমদার, বআ, ২০০৯, *গণতন্ত্র, নির্বাচন ও সুশাসন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মাহমুদ, ত ২০০৫, *করাপশন ডেটাবেজ রিপোর্ট ২০০৪*, টিআইবি, ঢাকা।

মাহমুদ, ত ২০০৬, *করাপশন ডেটাবেজ রিপোর্ট ২০০৫*, টিআইবি, ঢাকা।

মাহমুদ, ত ২০০৭, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬)*, টিআইবি, ঢাকা।

রোজেটি, জ, আফরোজ, ফ ও আকতার, ম ২০১২, 'পার্লামেন্টওয়াচ: নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সপ্তম অধিবেশন', টিআইবি, ঢাকা।

হাসান উজ্জামান, আম ২০০৬, 'বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা', জাহাঙ্গীর, ম (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

Besley, T and Larcinese, V 2005, *Working or Shirking? A Closer Look at MPs' Expenses and Parliamentary Attendance*, August.

'Codes of Conduct for Parliamentarians', <http://www.corisweb.org/> (accessed on 4 January 2007)

Ashraf, MA 2001, *Ethical Standards of Parliamentarians*, Bangladesh Institute of Parliamentary Studies, Dhaka.

Khemani, S 2001, *Decentralization and Accountability: Are Voters More Vigilant in Local than National Elections?*, Policy Research Working Paper 2557, Development Research Group, The World Bank, Washington.

Keefer, P and Vlaicu, R (undated), *Democracy, Credibility and Clientelism*, Development Research Group, Policy Research Working Paper 3472, The World Bank, Washington.

Liton, S 2012, 'Image of JS: Guilty, Who?', *The Daily Star*, 5 June.

Krishna, A 2002, "Seizing the Middle Ground: New Political Entrepreneurs in India" Mimeo, Department of Public Policy, Duke University.

McLean, I and McMillan, A (ed) 2006, *The Concise Dictionary of Politics*, Oxford University Press, New Delhi.

Mollah, MAH (undated), 'Good Governance in Bangladesh: Role of Parliament', Dept of Public Administration, University of Rajshahi.

Murray, Senator L 2000, 'MPs, Political Parties and Parliamentary Democracy', *isuma*, Volume 1 N 2, Autumn.

Norris, P 2004, *Are Australian MPs in Touch with Constituents?*, Australian Democratic Audit.

Rahman, J 2009, 'How Devolution Can Change Our Politics', *Forum*, Volume 4, Issue 3, March. http://www.thedailystar.net/forum/2009/march/devolution.htm (accessed on 8 October 2012)

Reynolds, A, Reilly, B, & Ellis, A 2005, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Stockholm.

Stapenhurst, R and Pelizzo, R 2006, 'Legislative Ethics and Codes of Conduct', in Stapenhurst, R, Johnston, N and Pelizzo, R (ed.), *The Role of Parliament in Curbing Corruption*, World Bank Institute, Washington.

Wilder, A 1999, *The Pakistani Voter: Electoral Politics and Voting Behavior in the Punjab*, Oxford University Press, Karachi.